



বজ্য নয়, সম্ভাবনার বীজ

পরিবেশ, অর্থনীতি ও মানব উন্নয়নে
এসডিসি'র বজ্য ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা

“ইকোলজি বান্ধব নিরাপদ সবজি উৎপাদন
ও বাজারজাতকরণ” ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প



EMBASSY OF DENMARK





বর্জ্য নয়, সম্ভাবনার বীজ

পরিবেশ, অর্থনীতি ও মানব উন্নয়নে এসডিসি'র বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা



সংগ্রহ



পুনর্ব্যবহার
(অজৈব)



পুনর্ব্যবহার
(জৈব)

“ইকোলজি বান্ধব নিরাপদ সবজি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ”

ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প





বর্জ্য নয়, সম্ভাবনার বীজ
পরিবেশ, অর্থনীতি ও মানব
উন্নয়নে এসডিসি'র বর্জ্য
ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা



উপদেষ্টামন্ডলী

কাজী আশরাফুল হাসান, নির্বাহী পরিচালক, সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (এসডিসি)।
জেসমিন আরা, ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও ভ্যালু চেইন প্রজেক্ট ম্যানেজার, পিকেএসএফ- আরএমটিপি প্রকল্প।
খোন্দকার হামিদুল ইসলাম, ডিরেক্টর অপারেশন্স, সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (এসডিসি)।

রচনা

বিপ্লব মহলদার, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এসডিসি

সম্পাদনা

রোকসানা পারভীন, ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলিটের (ভিসিএফ), সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (এসডিসি), আরএমটিপি, ফরিদপুর।
মোঃ রাশেদুল ইসলাম, মার্কেটিং ম্যানেজার, সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (এসডিসি), আরএমটিপি, ফরিদপুর।

প্রকাশক

সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (এসডিসি), ফরিদপুর।

ডিজাইন

কে এম মুনমুন হাফিজ

মুদ্রণ

মেথডিকা

সূচীপত্র

মুখবন্ধ	০৬
নির্বাহী পরিচালক, এসডিসি এর বার্তা :	০৭
উপ পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ফরিদপুর এর বার্তা	০৮
প্রথম অধ্যায় : বর্জ্য পরিচিতি	১১-১৮
বর্জ্য কি	১১
বর্জ্যের শ্রেণীবিভাগ	১১
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কি	১২
কেন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ	১২
বর্জ্যের পরিবেশগত প্রভাব	১৪
দ্বিতীয় অধ্যায় : বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সফলতার গল্প	২১-২৮
এসডিসি'র উদ্যোগঃ পরিচ্ছন্ন শহর গড়ার যাত্রা	২১
ওয়াকহোলিক এর উদ্যোগঃ বর্জ্য থেকে সম্পদ	২৬
আগামীর পথরেখা	২৮
তৃতীয় অধ্যায় : বাংলাদেশে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	৩১-৪৬
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও বাংলাদেশ	৩১
বাংলাদেশে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রতিবন্ধকতাসমূহ	৩৩
বাংলাদেশে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অংশীদারগণের দায়িত্ব	৩৬
বাংলাদেশে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায়-	
PPP (পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ) মডেলের কার্যকারিতা	৩৮
বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কতিপয় সম্ভাব্য কৌশল	৩৯
Waste to Energy: বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সর্বোত্তম কার্যকরী পন্থা	৪৪
বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ব্ল্যাক সোলজার ফ্লাই (BSF): কম খরচে কার্যকরী পন্থা	৪৫
চতুর্থ অধ্যায় : বর্জ্য থেকে আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি	৪৯-৬৬
বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় যুব সমাজের ভূমিকা	৪৯
বর্জ্য থেকে আয় করার সম্ভাব্য কৌশল	৫১
বর্জ্য থেকে আয় করার কিছু উদাহরণ	৬৪
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কিভাবে গ্রিনহাউস গ্যাস (মিথেন) নিঃসরণ কমায়?	৬৫



মুখবন্ধ

বাংলাদেশের দ্রুত নগরায়ন ও পরিবর্তিত ভোগসংস্কৃতি আমাদের সামনে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার এক জটিল বাস্তবতা উপস্থিত করেছে। গৃহস্থালি, বাজার, নির্মাণ ও চিকিৎসা কেন্দ্র-বিবিধ উৎস থেকে উৎপন্ন মিশ্র বর্জ্য আজ শুধু পরিচ্ছন্নতার প্রশ্ন নয়; এটি জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ ও জলবায়ু-সহনশীলতার প্রশ্ন। উৎসে পৃথকীকরণের অভাব, সময়নিষ্ঠ সংগ্রহব্যবস্থার দুর্বলতা, সীমিত অবকাঠামো, পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্তের অনুপস্থিতি এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আন্তঃসমন্বয়ের ঘাটতি-এসবই সমস্যাটিকে দীর্ঘায়িত করেছে। এর ফল বহুমাত্রিক: জলাবদ্ধতা, রোগজীবাণুর বিস্তার, গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন, মাটি-জল-বায়ুর দূষণ, এবং নগর সেবায় অতিরিক্ত আর্থিক চাপ-যা সরাসরি নাগরিক কল্যাণ ও উৎপাদনশীলতা ক্ষুণ্ণ করেছে।

তবু সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত। যদি বর্জ্যের জৈব অংশকে জৈব সার ও বায়োএনার্জিতে রূপান্তরিত করা যায় এবং অজৈব বর্জ্য-প্লাস্টিক, কাঁচ, ধাতু ইত্যাদিকে পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ করা যায়, তাহলে স্থানীয় শিল্পে কাঁচামালের যোগান ঘটে; যা আমদানি নির্ভরতা কমাতে পারে। তাই যদি একটি নির্ভরযোগ্য বর্জ্য সংগ্রহ-পরিবহন-প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থা, অর্থাৎ একটি কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ভ্যালু চেইন প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে স্বাস্থ্যব্যয় হ্রাস পাবে, বর্জ্য ডাম্পিংয়ের ফলে জমির উপর চাপ কমবে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং সার্কুলার ইকোনমিতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে।

মূল সমাধান যতটা না বজ্জগত (হার্ডওয়ার) পর্যায়ে-তার থেকে বেশী মনস্তাত্ত্বিক পর্যায়ে। উদাহরণস্বরূপ- স্থানীয় জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে নাগরিক আচরণে পরিবর্তন এনে উৎসে পৃথকীকরণকে অভ্যাসে পরিণত করা, আলদাভাবে ডোর-টু-ডোর সংগ্রহ নিশ্চিত করা, সকল ধরনের রিসোর্সের সর্বোত্তম ব্যবহার, দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, বর্জ্য সংগ্রহ ও রিসাইক্লিং এর জন্য কার্যকর পছন্দ (মেকানিক্যাল পদ্ধতিতে সেগ্রিগেশন, বায়ো-গ্যাস, ব্লাক সোলজার ফ্লাই ইত্যাদি) অবলম্বন ইত্যাদি এই কার্যক্রমকে সুসংগঠিত ও স্থায়ীত্ব প্রদান করতে পারে। এই কার্যক্রমকে আরও আধুনিকায়ন করতে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে যথাযথ প্রযুক্তি (সফটওয়্যার, এপ্লিকেশন) ব্যবহার করে সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা ও মনিটরিং করতে হবে-যাতে গ্রাহকগন সার্ভিস গ্রহন, অভিযোগ প্রদান, সার্ভিস চার্জ পরিশোধ, পরামর্শ ও ফিডব্যাক প্রদানের জন্য একটি প্লাটফর্ম খুঁজে পান এবং সেবা প্রদানকারী সংস্থা আর্থিক অনিয়ম নিরূপণ সহ সহজে নির্ভুল তথ্য প্রদান করতে সক্ষম হন। এক্ষেত্রে, সকল অংশীদারীগণ (সরকারি, বেসরকারি, নাগরিক সমাজ, গনমাধ্যম ইত্যাদি) এর সমন্বয়ে তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত ও অংশীদারিত্বমূলক সহযোগিতা (অর্থায়ন, পরামর্শ, তথ্য প্রদান, ইত্যাদি)-র একান্ত প্রয়োজন। আর তাহলেই দেশের পরিবেশ উন্নয়নের পাশাপাশি বর্জ্যকে “সমস্যা” থেকে “সম্পদে” রূপান্তর করা সহজতর হবে।

তবে, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে শুধুমাত্র আর্থিক লাভবান হওয়াটা মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করলে এই কার্যক্রমে ভালো ফলাফল নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। একটি দেশের পরিবেশ উন্নয়নে ভূমিকা রাখাটাই মূল আত্মতৃপ্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়; কিন্তু সেক্ষেত্রে, কার্যক্রম পরিচালনা ও পদ্ধতিগত উন্নয়নে আর্থিক সহযোগিতা নিশ্চিত করতে সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আর্থিক অনুদান ও কঠোর মনিটরিং নিশ্চিত করতে হবে। এসবের পাশাপাশি সাধারণ জনগনকে সচেতন ও নিষেধাজ্ঞা প্রদান করতে জাতীয় সরকারকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণয়ন, রিসাইক্লিং এর জন্য কার্যকর অবকাঠামো উন্নয়নসহ সেগুলো যথাযথভাবে ব্যবহারের দক্ষ জনবল তৈরী ও সকল ধরনের মিডিয়ায় ক্রমাগত প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে। আর তাহলেই দ্রুত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটবে।

এই প্রকাশনায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় এসডিসির বিগত ১০ বছরের পৌরবর্জ্য ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে কৃষিবর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা সহ গবেষণা যুক্ত করে বাংলাদেশের বাস্তব প্রেক্ষাপটে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার একটি ব্যবহারিক কাঠামো উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য একটাই-পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর ও জলবায়ু-সহনশীল দেশ গড়ার পথে বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে কার্যকর ও টেকসই রূপ দেওয়া; যাতে নীতিনির্ধারক, বাস্তবায়নকারী, গবেষক ও নাগরিক-সকলের হাতে থাকে প্রয়োগযোগ্য এক পছন্দ। তাই এই প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য পিকেএসএফ এর RMTF প্রকল্পের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

খোন্দকার হামিদুল ইসলাম

পরিচালক (অপারেসন্স), এসডিসি।



নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের বার্তা

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলভিত্তিক বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা, সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (এসডিসি) ১৯৮৮ সালে একটি স্থানীয় বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হিসেবে যে যাত্রা শুরু করেছিল, তা আজ টেকসই উন্নয়ন ও পরিবেশ সুরক্ষার এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় পরিণত হয়েছে। প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন থেকেই এসডিসি দেশের পরিবেশ এবং আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে একনিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে আসছে। এই অগ্রযাত্রায় নারী, শিশু, কৃষক ও সমাজের পিছিয়ে পড়া বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার দিয়ে পরিচালিত বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্প এবং ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে বর্তমানে সংস্থাটি ২.৫ লক্ষাধিকেরও বেশি উপকারভোগীর জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচির পাশাপাশি, এসডিসি দেশের পরিবেশ সুরক্ষায় নিজস্ব প্রচেষ্টায় নগর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মতো গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। কারন, আমরা সকলেই অবগত যে, বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল বিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নীমিত সক্ষমতা এবং দ্রুত নগরায়ণের কারণে বিবিধ উৎস থেকে উৎপন্ন মিশ্র বর্জ্য জনস্বাস্থ্য, পরিবেশগত স্থিতিশীলতা এবং সর্বোপরি জলবায়ু সহনশীলতার উপর দারুণভাবে খারাপ প্রভাব ফেলছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আমাদের অসচেতনতা, অপরিপাক্য সংগ্রহব্যবস্থা, যথাযথ প্রযুক্তি প্রয়োগে অক্ষমতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের অভাব এই কারনগুলো পরিবেশ, জনস্বাস্থ্য ও অর্থনীতির সমূহ ক্ষতিসাধন করছে।

এই জটিল প্রেক্ষাপটে, এসডিসি ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচিসহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক প্রকল্পের অভিজ্ঞতার আলোকে ২০১৬ সাল থেকে বাংলাদেশের নগর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এক নতুন এবং কার্যকর দিগন্ত উন্মোচন করেছে। টেকসই ও লাভজনক সমাধানের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে প্রথম দিকে ফরিদপুর পৌরসভা এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা, Practical Action-এর সাথে কৌশলগত অংশীদারিত্বে একটি পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) মডেলে কাজ শুরু করেছিলো। এই মডেলের মূল লক্ষ্য ছিল- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে কেবল সেবামূলক না রেখে এটিকে একটি লাভজনক ব্যবসায়িক মডেলে প্রতিষ্ঠিত করা; যাতে কার্যক্রমটি স্থায়ীত্ব লাভ করে। এরই ধারাবাহিকতায়, ২০১৭ সালে এসডিসি ফরিদপুরে ইন্টিগ্রেটেড সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট (ISWM) কর্মসূচির সূচনা করে; যা বর্তমানে সম্প্রসারিত হয়ে চারটি (০৪) পৌরসভায় সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ভবিষ্যতের পথে এসডিসি আত্মপ্রত্যয়ী এবং দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। সংস্থার পরবর্তী লক্ষ্য হলো- বর্জ্য ব্যবস্থাপনার এই টেকসই মডেলকে দেশের অন্যান্য পৌরসভায় সম্প্রসারণ, সংগৃহীত বর্জ্যকে পুনর্ব্যবহার ও প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন ঘটানো এবং যথাযথ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এর পদ্ধতিগত উন্নয়ন করা। সংস্থা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, এই টেকসই পরিবর্তন কখনোই সমষ্টিগত উদ্যোগ ছাড়া সম্ভব নয়। স্থানীয় সরকার, বেসরকারি খাত, উন্নয়ন-সহযোগী, নাগরিক সমাজ ও তরুণ প্রজন্ম-সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এসডিসি'র এই যাত্রা সফল হবে বলে আমরা আশাবাদী।

এই কার্যক্রমকে বর্ধিত ও টেকসই করার ক্ষেত্রে পলী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) বিগত কয়েক বছর ধরে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করছে। বিশেষ করে, পিকেএসএফ-এর আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় “ইকোলজি বান্ধব নিরাপদ সবজি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ” ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পে এসডিসি'র উৎপাদিত জৈব সারের ব্যবহার একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে; যা কৃষকদের কৃষি খরচ কমানোর পাশাপাশি জমির উর্বরতা, ফসলের উৎপাদন ও মান বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছে। এই প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে প্রকল্পভূক্ত এলাকার কৃষকদেরকে নিরাপদ সবজি উৎপাদনে ও জনসাধারণকে নিরাপদ সবজি গ্রহণে ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য আমরা RMTP প্রকল্পের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এই প্রকাশনাটি দেশের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে সামান্যতম অবদান রাখলেও আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

ধন্যবাদান্তে,

কাজী আশরাফুল হাসান

প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক, এসডিসি

বার্তা



ফরিদপুরসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবেশ সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, বর্ষিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমে সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (এসডিসি) একটি স্বনামধন্য ও দায়িত্বশীল উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। ১৯৮৮ সালে ফরিদপুর জেলায় প্রতিষ্ঠার পর থেকে এসডিসি বর্তমানে দেশের ২২টি জেলায় সুনামের সঙ্গে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে যা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার।

বিশেষ করে, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খাতে এসডিসির অবদান অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। ফরিদপুর জেলায় গৃহস্থালি বর্জ্য, পয়ঃবর্জ্য এবং চিকিৎসা বর্জ্যের সুশৃঙ্খল ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় এসডিসি একমাত্র অগ্রণী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে। নগর পরিবেশকে নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর ও বাসযোগ্য করতে এ কার্যক্রমগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম।

পরিবেশ দূষণ হ্রাস এবং প্লাস্টিকের ক্ষতিকর প্রভাব কমানোর লক্ষ্যে এসডিসি একটি আধুনিক প্লাস্টিক রিসাইক্লিং প্ল্যান্ট স্থাপন করেছে। এখানে পরিত্যক্ত ও ব্যবহার করা পলিথিন পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে পাইরোলাইসিস ওয়েল ও কার্বন উৎপাদন করা হয়। এ উদ্যোগের ফলে নদী, খাল, ড়েন ও নগর এলাকার পলিথিন দূষণ হ্রাসে বাস্তব ও দৃশ্যমান অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। একই সঙ্গে এটি চক্রাকার অর্থনীতি (Circular Economy) গঠনে ভূমিকা রাখছে, যা পরিবেশবান্ধব শহর গড়ার পথে গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ।

এসডিসি পরিবেশ বিষয়ক জনসচেতনতা বৃদ্ধিতেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রতিবছর বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপনে পরিবেশ অধিদপ্তরের সঙ্গে তাদের সক্রিয়

অংশগ্রহণ, সেই সঙ্গে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবস পালন-এসডিসির পরিবেশবান্ধব অঙ্গীকার ও সামাজিক দায়িত্ববোধেরই প্রতিফলন। পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা এবং অসহায় জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে এসডিসির নিরলস প্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য, পিকেএসএফ-এর আরএমটিপি (RMTP) প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত “ইকোলজি-বান্ধব নিরাপদ সবজি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ” ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পে এসডিসি-উৎপাদিত জৈব সার ব্যবহারের মাধ্যমে একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে। এ জৈব সার কৃষকদের উৎপাদন খরচ কমানো, ফসলের গুণগত মান বৃদ্ধি এবং জমির দীর্ঘমেয়াদি উর্বরতা পুনরুদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে-যা টেকসই কৃষি ব্যবস্থার দিকে একটি বাস্তব অগ্রগতি।

এই প্রকাশনার মাধ্যমে দেশের সর্বস্তরের জনগণকে পরিবেশ দূষণ রোধে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সচেতন করার যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, তার জন্য আমরা RMTP প্রকল্পের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এসডিসি ভবিষ্যতেও তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখে পরিবেশ উন্নয়ন, নাগরিক সেবা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

মোঃ সাঈদ আনোয়ার

উপ পরিচালক

পরিবেশ অধিদপ্তর, ফরিদপুর জেলা কার্যালয়, ফরিদপুর।

অধ্যায় - ০১
বর্জ্য পরিচিতি



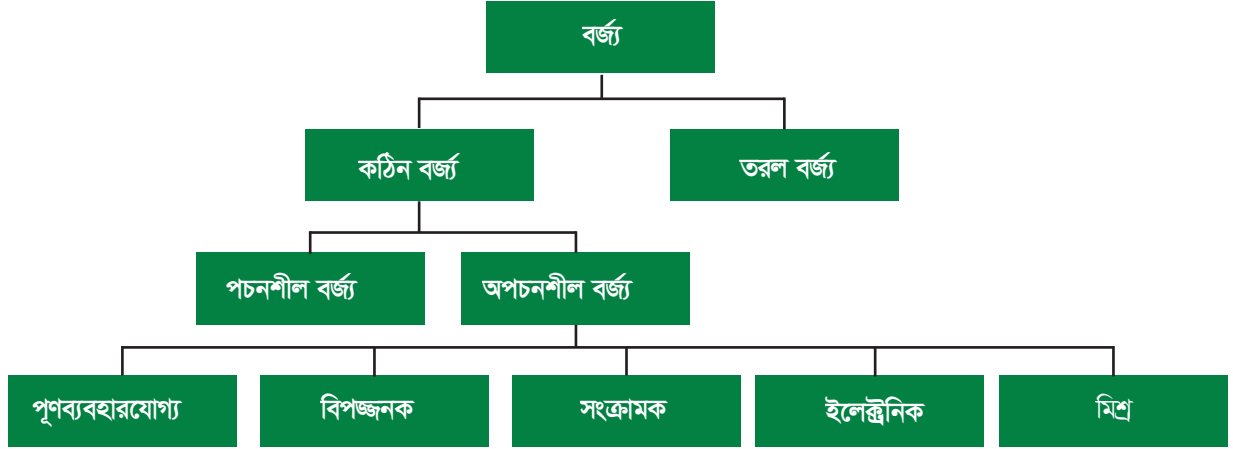


১.১ বর্জ্য (Waste) কী ?

বিভিন্ন উৎস থেকে উৎপন্ন এমন অবাঞ্ছিত পদার্থ বা উপাদান, যা মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারে আর কাজে আসে না কিংবা যার আর কোনো ব্যবহার করার উপযোগিতা নেই, তাকে বর্জ্য বলা হয়। সাধারণ ভাষায়, আমরা যা ফেলে দেই এবং আর দরকারী মনে করি না, সেটাই বর্জ্য। যেমনঃ গৃহস্থালির বর্জ্য, বাণিজ্যিক বর্জ্য, শিল্প বর্জ্য, কৃষি বর্জ্য, হাসপাতাল বা ক্লিনিক্যাল বর্জ্য, প্রাতিষ্ঠানিক বর্জ্য, বিপজ্জনক বর্জ্য, কৃষিজাত বর্জ্য, মার্কেট বর্জ্য, নির্মাণ বর্জ্য, রাস্তার ধুলোবালি, নালা পরিষ্কারের বর্জ্য, ঋতুভিত্তিক বর্জ্য, পয়ঃবর্জ্য ইত্যাদি।

১.২ বর্জ্যের শ্রেণিবিভাগ

আমাদের আশেপাশের যেসব বর্জ্য আমরা দেখতে পাই তাদেরকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণীবিভক্ত করতে পারিঃ



কঠিন বর্জ্য

সকল ধরনের জৈব বা পচনশীল বা অজৈব বা অপচনশীল বর্জ্য যা কঠিন পদার্থ থেকে তৈরী হয় তাদেরকে কঠিন বর্জ্য বলা হয়। যেমনঃ রান্নার বর্জ্য, প্লাস্টিকজাত বর্জ্য, প্যাকেটজাত বর্জ্য, মেডিক্যাল বর্জ্য ইত্যাদি।

তরল বর্জ্য

যে সকল বর্জ্য তরল পদার্থ জাতীয় তাদেরকে তরল বর্জ্য বলা হয়। যেমন-কলকারখানা হতে নির্গত তরল রাসায়নিক, স্টিকি ট্যাংক বা পিটের তরল পয়ঃবর্জ্য, মূত্র, ময়লাযুক্ত পানি, বিষযুক্ত বা বিষাক্ত তরল, ড্রেনের পানি, ইত্যাদি। বেশীরভাগ তরল বর্জ্য আবার বিপজ্জনক বা সংক্রামক বর্জ্যের পর্যায়ে পড়ে।

কঠিন বর্জ্য সাধারণতঃ দুই ধরনের-

জৈব বা পঁচনশীল বর্জ্য: প্রাকৃতিকভাবে পঁচে যায় এমন কঠিন বর্জ্য, যেগুলো ব্যাকটেরিয়া বা জীবানু দ্বারা দ্রুত পচে যেতে সক্ষম। উদাহরণ: খাদ্যের উচ্ছিষ্ট অংশ, ফলের খোসা, উদ্ভিদের শুকনো পাতাযুক্ত আবর্জনা ইত্যাদি। এসব জৈব বর্জ্য থেকে কম্পোস্ট (জৈব সার) তৈরি করে মাটির উর্বরতা বাড়ানো সম্ভব। এগুলো প্রাকৃতিকভাবে মাটির সাথে মিশেও মাটির জৈব অংশ বৃদ্ধি করতে পারে। আলাদাকরণের ক্ষেত্রে এগুলোকে সবুজ পাঞ্চে রাখা হয়।

অজৈব বা অপঁচনশীল বর্জ্য: যা সহজে জীবাণুবিরোধ্য নয় অর্থাৎ দ্রুত পঁচে যায় না বা নষ্ট হয় না। উদাহরণ: প্লাস্টিক সামগ্রী, কাঁচের টুকরা, ধাতব পদার্থ, পলিথিন ব্যাগ, স্টাইরোফোম ইত্যাদি। এ ধরনের বর্জ্য শত শত বছর মাটিতে থেকে যেতে পারে এবং পরিবেশ দূষণ করতে পারে।

অপঁচনশীল বর্জ্যকে সাধারণভাবে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা যায়-

পুনর্ব্যবহারযোগ্য বর্জ্য: যে সকল অপঁচনশীল বর্জ্য ফেলে না দিয়ে আবার প্রক্রিয়া করে নতুন করে ব্যবহার করা নিরাপদ তাদেরকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য বর্জ্য বলে। উদাহরণ: কাগজ, প্লাস্টিক বোতল, কাঁচের বোতল, ধাতব বর্জ্য, পলিথিন ইত্যাদি। এসব জিনিস কারখানায় পুনঃপ্রক্রিয়াজাত (রিসাইক্লিং) করে নতুন পণ্য তৈরি করে বা একটু পরিবর্তন করে নতুন কাজে (রিপারপাস) ব্যবহার করা সম্ভব। পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে বর্জ্য কমে এবং সম্পদের কার্যকর ব্যবহার হয়। যেটা ঘূর্ণায়মান অর্থনীতি (সার্কুলার ইকোনমি)-তে অবদান রাখতে পারে। আলাদাকরণের ক্ষেত্রে এগুলোকে নীল পাঞ্চে রাখা হয়।



বিপজ্জনক বর্জ্য: বিভিন্ন রাসায়নিক, বিষাক্ত ও ধারালো বর্জ্য যা মানবস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। উদাহরণ: ব্যাটারি, কীটনাশকের বোতল, ভাঙ্গা কাঁচ, সূঁচ, বিবিধ রাসায়নিক বা বিস্ফোরক পদার্থ ইত্যাদি। এসব বর্জ্য থেকে বিষাক্ত পদার্থ নিঃসরণ হতে পারে, তাই বিশেষ সতর্কতার সাথে আলাদা করা প্রয়োজন। আলাদাকরণের ক্ষেত্রে এগুলোকে লাল পাত্রে রাখা হয়।

মেডিক্যাল বা সংক্রামক বর্জ্য: যে সকল বর্জ্যে সংক্রামক জীবানুর উপস্থিতি বিদ্যমান সেগুলোকে সংক্রামক বর্জ্য বলা হয়। সাধারণতঃ হাসপাতালের বর্জ্যগুলোকে এই বর্জ্যের আওতায় গণ্য করা হয়। যেমন-হাসপাতালের সিরিঞ্জ, সূঁচ, গোবস, ব্যবহৃত তুলা ইত্যাদি। কিন্তু এগুলো ছাড়াও বাসা-বাড়ি হতে প্রাপ্ত স্যানিটারী ন্যাপকিন, ডায়াপার, মল ইত্যাদি সংক্রামক বর্জ্য হিসেবে ধরা হয়। এগুলোকে চিহ্নিত করা খুব জরুরী। তা না হলে এ সকল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সময় এর দ্বারা জীবকুল স্বাস্থ্যগত ঝুঁকিতে পড়তে পারে। তাই আলাদাকরণের ক্ষেত্রে এগুলোকে হলুদ পাত্রে রাখা হয়।



সাধারণ মিশ্র বর্জ্য: সকল ধরনের প্যাকেটজাত বর্জ্য ও ধূলা-বালিকে সাধারণ মিশ্র বর্জ্য হিসেবে গণ্য করা হয়। সকল ধরনের খাবারের প্যাকেট যেগুলোর ভিতরে সাধারণতঃ ০৩টি স্তর থাকে। যথা-বাইরের স্তর (পলিয়েস্টার), মাঝখানের স্তর (অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল) ও ভিতরের স্তর (পলিপ্রোপিলিন)। তবে কমদামী প্যাকেটে প্রথম দুটি স্তর থাকে। আলাদাকরণের ক্ষেত্রে এগুলোকে কালো পাত্রে রাখা হয়।

ইলেকট্রনিক বর্জ্য: সকল ধরনের নষ্ট ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিকে ইলেকট্রনিক বর্জ্যকে ইলেকট্রনিক বর্জ্য বলা হয়। যেমন- মোবাইল, কম্পিউটার পার্টস, চার্জার, ল্যাপটপ, ক্যালকুলেটর ইত্যাদি। এগুলোর ভিতর সামান্য পারদ, রূপা, সোনা ও অন্যান্য কিছু দামী ধাতু থাকার কারণে এগুলোর বাজার তৈরী হয়েছে। তাই আলাদাকরণের ক্ষেত্রে এগুলোকে সাদা পাত্রে রাখা হয়।

১.৩ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কী

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বলতে বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পুনর্ব্যবহার এবং সঠিকভাবে নিষ্পত্তি করার সমন্বিত প্রক্রিয়াকে বোঝায়। সহজভাবে বললে, আমাদের পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের ক্ষতি এড়াতে এবং সম্পদ পুনঃউপযোগিতা করতে যে সব পদক্ষেপ নেওয়া হয়; যেমন- বর্জ্য সংগ্রহ করা, বাঁছাই, পুনঃব্যবহারযোগ্য বা রিসাইক্লিং করা

এবং যে বর্জ্য ব্যবহারযোগ্য নয় সেগুলো নিরাপদে ফেলে দেওয়া- এই সম্পূর্ণ ব্যবস্থাটাই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিবেশের সৌন্দর্য রক্ষা করা, বর্জ্য দ্বারা সামগ্রিক পরিবেশের ক্ষতি থেকে রক্ষা করা, বর্জ্য থেকে সৃষ্ট জীবানু দ্বারা রোগের ঝুঁকি কমানো এবং নতুন সম্পদ তৈরির মাধ্যমে বর্জ্যকে সম্পদে পরিনত করাই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য।

১.৪ কেন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেবল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয় নয়; এটি জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ, অর্থনীতি এবং টেকসই উন্নয়নের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত একটি মৌলিক প্রয়োজন। বাংলাদেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ ও জলবায়ু-সংবেদনশীল দেশে সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা না থাকলে এর প্রভাব ভয়াবহ হতে পারে। স্বাস্থ্যঝুঁকি থেকে শুরু করে জলবায়ু পরিবর্তন পর্যন্ত। নিচে উদাহরণসহ এর গুরুত্ব তুলে ধরা হলো:





স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা

যেখানে-সেখানে বর্জ্য ফেলে রাখলে তা দ্রুত পঁচে রোগজীবাণুর আঁতুড়ঘরে পরিণত হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা বা রাজশাহীর মতো

ঘনবসতিপূর্ণ শহরে পঁচা বর্জ্য থেকে নির্গত ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস বায়ু ও পানির মাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে ডায়রিয়া, কলেরা, টাইফয়েড, হেপাটাইটিস, ডেংগু ও চিকুনগুনিয়ার মতো রোগ ছড়িয়ে পড়ে যা প্রতি বছর হাজারো মানুষকে আক্রান্ত করে। সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা যেমন সময়মতো বর্জ্য অপসারণ, সেগ্রিগেশন (জৈব ও অজৈব আলাদা রাখা), এবং নিরাপদ নিষ্পত্তি-জনস্বাস্থ্যের এই ঝুঁকিগুলো নাটকীয়ভাবে কমিয়ে আনতে পারে।

পরিবেশ ও জলবায়ু রক্ষা

বাংলাদেশের নদী, খাল, বিল ও উপকূলীয় অঞ্চলগুলো অযাচিত বর্জ্য ফেলার কারণে মারাত্মকভাবে দূষিত হচ্ছে। প্লাস্টিক বর্জ্য নদীর প্রবাহ

বাধাগ্রস্ত করছে, সামুদ্রিক প্রাণী তা খেয়ে মারা যাচ্ছে। কারখানার তরল বর্জ্য নদীতে মিশে পানির মান নষ্ট করছে, মাটি হারাচ্ছে উর্বরতা। অন্যদিকে, পচনশীল জৈব বর্জ্য থেকে উৎপন্ন মিথেন গ্যাস জলবায়ু পরিবর্তনে অবদান রাখছে বাংলাদেশের জন্য সরাসরি হুমকি। যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই ক্ষতি রোধ করা সম্ভব। যেমন রিসাইক্লিং (Recycling), কম্পোস্টিং (Composting) এবং বর্জ্য থেকে শক্তি

উৎপাদন (Waste-to-Energy) প্রযুক্তি প্রয়োগ করলে দূষণ কমে, পাশাপাশি গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনও হ্রাস পায়।

পরিচ্ছন্ন শহর ও টেকসই নগরজীবন

বাংলাদেশের দ্রুত নগরায়ণ, নগর বর্জ্যের পরিমাণ বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। যদি এই বর্জ্য সঠিকভাবে ব্যবস্থাপিত না হয়, তাহলে শহরের

রাস্তাঘাট, বাজার, পার্ক ও খাল-বিল আবর্জনায় ভরে যায়, যা শুধু দূষণদূষণই নয়, নাগরিক জীবনের মানও নষ্ট করে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের 'বর্জ্য থেকে সম্পদ' উদ্যোগ, চট্টগ্রামের কম্পোস্টিং প্রোগ্রাম, এবং বিভিন্ন এনজিওর নেতৃত্বে পরিচালিত কমিউনিটি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পগুলো প্রমাণ করেছে যে সচেতন নাগরিক উদ্যোগ ও প্রশাসনিক দক্ষতা একত্রে কাজ করলে শহরগুলো পরিচ্ছন্ন ও বাসযোগ্য রাখা সম্ভব।





সম্পদ ও শক্তি সংরক্ষণ

বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে টেকসই দিক হলো এর মাধ্যমে নতুন সম্পদ সৃষ্টির সম্ভাবনা। একটি প্লাস্টিক বোতল রিসাইকেল করলে নতুন বোতল তৈরিতে কম পেট্রোলিয়াম লাগে; পুরনো কাগজ পুনর্ব্যবহার করলে নতুন কাগজের জন্য কম গাছ কাটতে হয়। এছাড়া, জৈব বর্জ্য থেকে তৈরি কম্পোস্ট কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহারে রাসায়নিক সারের প্রয়োজন কমে, ফলে মাটি হয় উর্বর ও টেকসই। কিছু পৌরসভা ইতিমধ্যে “বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ” প্রকল্প চালু করেছে, যা একই সঙ্গে জ্বালানি সাশ্রয় ও পরিবেশ সংরক্ষণে সহায়ক।

বাংলাদেশে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এখন আর বিলাসিতা নয়, এটি একটি জাতীয় প্রয়োজন। সরকারের পাশাপাশি নাগরিক সমাজ, স্থানীয় প্রশাসন, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্মিলিত দায়িত্ব হলো “বর্জ্যকে সম্পদে” রূপান্তর করা। সঠিক পরিকল্পনা, প্রযুক্তি, ও সচেতনতার মাধ্যমে আমরা একটি পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর ও টেকসই বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারি যেখানে উন্নয়ন ও পরিবেশ একে অপরের পরিপূরক হবে।

১.৫ বর্জ্যের পরিবেশগত প্রভাব

বর্জ্য কেবল অস্বস্তিকর দৃশ্য বা দুর্গন্ধের কারণ নয়—এটি বাংলাদেশের পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য, কৃষি, এমনকি মানবস্বাস্থ্যের ওপরও বহুমাত্রিক প্রভাব ফেলছে। বিশেষত প্লাস্টিক, জৈব ও ইলেকট্রনিক বর্জ্য বর্তমানে সবচেয়ে বড় তিনটি পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত। নিচে তাদের প্রভাব ও সম্ভাব্য সমাধান আলোচনা করা হলো:

জৈব বর্জ্য (Organic Waste)

উৎস ও গঠন

আমাদের দৈনন্দিন রান্নাবান্না, ফলমূলের খোসা, সবজি কাটা অংশ, বাসি খাবার ইত্যাদি জৈব বর্জ্য হিসেবে গণ্য হয়। বাংলাদেশের শহরাঞ্চলের মোট গৃহস্থালি বর্জ্যের ৫০-৭০% অংশই জৈব বর্জ্য।

পরিবেশ ও মানবস্বাস্থ্যের উপর বর্জ্যের প্রভাব

■ **রোগজীবাণুর বিস্তার:** যখন জৈব বর্জ্য খোলা জায়গায় ফেলা হয়, তখন সেখান থেকে জন্ম নেয় মশা, মাছি ও ইঁদুরের মতো জীবাণুবাহী কীটপতঙ্গ। এই মাধ্যমেই ডায়রিয়া, টাইফয়েড, কলেরা ও ডেংগুর মতো রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। একটি অব্যবস্থাপিত বর্জ্যের স্তুপ, অজান্তেই হয়ে ওঠে রোগের কারখানা।

■ **জলাবদ্ধতা ও ড্রেনেজ সংকট:** যখন বর্জ্য ড্রেনে ফেলা হয়, তখন তা ড্রেনেজ সিস্টেমে জমে গিয়ে পানি প্রবাহ বন্ধ করে দেয়। বর্জ্য পঁচে উৎপন্ন করে দুর্গন্ধ, জীবাণু ও বিষাক্ত গ্যাস, যা আশপাশের পরিবেশকে নোংরা করে তোলে। একটু বৃষ্টি হলেই সেই জীবাণুযুক্ত পানি রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে-পদে পদে দূষিত পানি, ময়লা ও রোগের ঝুঁকি। এভাবে খাবারের উচ্ছিষ্টও হয়ে উঠতে পারে নগর স্বাস্থ্য সংকটের সূচনা।

■ **জল দূষণ ও পানির উৎসের ক্ষতি:** যেখানে-সেখানে ফেলা বর্জ্য বৃষ্টির পানির সঙ্গে মিশে নদী, খাল ও ভূগর্ভস্থ পানির উৎসে প্রবেশ করে। ফলে পানিতে মিশে যায় রোগজীবাণু ও বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ, যা কেবল নদী বা মাছের জন্য নয়, মানবজীবনের



প্রতিটি স্তরের জন্য ভয়াবহ হুমকি। পরিষ্কার পানির সংকট বাড়ে, আর জলজ প্রাণের মৃত্যু বাড়ে প্রতিদিন।

■ গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমন ও জলবায়ু পরিবর্তনঃ অক্সিজেনবিহীনভাবে (anaerobic) বর্জ্য পচে উৎপন্ন হয় মিথেন গ্যাস (CH₄)-যা কার্বন ডাইঅক্সাইডের তুলনায় ২৫ গুণ বেশি শক্তিশালী গ্রীনহাউস গ্যাস। ফলে ত্বরান্বিত হয় জলবায়ু পরিবর্তন, তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও বন্যা-খরার মতো চরম আবহাওয়ার ঝুঁকি। অর্থাৎ, অব্যবস্থাপিত একটি বর্জ্য শুধু স্থানীয় নয়, বৈশ্বিক পরিবেশকেও প্রভাবিত করে।

সমাধান: কম্পোস্টিং (Composting)

অক্সিজেনের মাধ্যমে খাদ্যবর্জ্য পঁচিয়ে প্রাকৃতিক সার তৈরি করা যায়। এতে

- পরিবেশ দূষণ কমে
- মাটির উর্বরতা বাড়ে।
- রাসায়নিক সার ব্যবহারের প্রয়োজন হ্রাস পায়।
- উৎপাদিত ফসল মানব স্বাস্থ্যের জন্য অধিকতর নিরাপদ হয়।

প্লাস্টিক বর্জ্য

১৮৮৫ সালে অলেকজান্ডার পার্ক নামের এক বিজ্ঞানী সেলুলোজ, পাস্টিসাইজার এবং অন্যান্য দ্রাবক পদার্থের সমন্বয়ে প্রথম দূর্ঘটনাবশতঃ প্লাস্টিক তৈরি করে ফেলেন। আমরা যেসব প্লাস্টিক জাতীয় দ্রব্যাদি ব্যবহার করি সেগুলো তৈরি হয় তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করে। যখন এসব জ্বালানি খনি থেকে নিষ্কাশন করা হয়, তখন বিপুল পরিমাণ দূষিত পদার্থের নির্গমন ঘটে। এসব পদার্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন ডাই অক্সাইড, বেনজিন এবং মিথেন। এসব গ্যাসকে গ্রীনহাউস গ্যাস বলা হয়। আর গ্রীনহাউস গ্যাস বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য দায়ী। আর বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে হিমালয়ের বরফ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে-বিনষ্ট হচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্যতা। তাইতো বাড়ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিমাণ।



গত এক দশকে বাংলাদেশে প্লাস্টিকের ব্যবহার বিপুলভাবে বেড়েছে। শহুরে জীবনধারা, প্রক্রিয়াজাত খাদ্যশিল্প ও আধুনিক প্যাকেজিং ব্যবস্থার কারণে একবার ব্যবহারযোগ্য (Single-Use Plastic) সামগ্রীর ব্যবহার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুযায়ী, ঢাকা শহরে প্রতি ব্যক্তি বছরে গড়ে ২৪ কেজি প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপন্ন করেন, যেখানে ২০০৫ সালে এই হার ছিল মাত্র ৩ কেজি। জাতীয় পর্যায়ে বছরে প্রায় ৮৭,০০০ টন একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বর্জ্য তৈরি হয়, যার ৬৬% অনিয়ন্ত্রিতভাবে খোলা জায়গায় পড়ে থাকে বা নদী-নালায় মিশে যায়।

প্লাস্টিক বর্জ্যের প্রধান উৎস

বাংলাদেশে প্লাস্টিক দূষণের মূল উৎসগুলো হলোঃ

- খাদ্য পণ্যের প্যাকেজিং: চিপস, বিস্কুট, স্ন্যাকস, পানীয় বোতল, স্ট্র, কাপ ইত্যাদি
- বাজারের পলিথিন ব্যাগ: একবার ব্যবহারের পর ফেলে দেওয়া হয়
- অফিস ও গৃহস্থালি সামগ্রী: ফাইল কভার, ডাস্টবিন লাইনিং, ডিসপোজেবল কাপ-পেট
- অ্যাগ্রো-প্লাস্টিক: কৃষি উৎপাদন, সারের প্যাকেজিং প্রভৃতি
- চিকিৎসা বর্জ্য: ইনজেকশন সিরিঞ্জ, গ্লাভস, মাস্ক ইত্যাদি

পরিবেশগত প্রভাব

১. **ড্রেন ও খাল-নালায় বন্ধ হয়ে যাওয়া:** পলিথিন ও প্লাস্টিকের আবর্জনা শহর ও গ্রামীণ ড্রেনেজ ব্যবস্থা বন্ধ করে দেয়, ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়।
২. **জলজ জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি:** নদী ও সাগরে ফেলা প্লাস্টিক পঁচে না; বরং মাইক্রোপ্লাস্টিক কণায় ভেঙে মাছ ও জলজ প্রাণীর শরীরে



প্রবেশ করে। পরবর্তীতে এই মাছ খাওয়ার মাধ্যমে মানবদেহেও প্রবেশ করে, যা ক্যান্সার, হরমোনজনিত সমস্যা ও বন্ধ্যাত্বের ঝুঁকি বাড়ায়।

৩. **জমির উর্বরতা হ্রাস:** মাটিতে প্লাস্টিক জমে বায়ু ও পানির প্রবাহ ব্যাহত করে, ফলে কৃষি উৎপাদন কমে যায়।
৪. **দাহ্যতা ও বিষাক্ত গ্যাস:** খোলা জায়গায় প্লাস্টিক পোড়ালে ডাইঅক্সিন, ফিউরান ও কার্সিনোজেনিক গ্যাস নির্গত হয়-যা ফুসফুস, হৃদপিণ্ড ও স্নায়ুতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর।
৫. **গ্রীনহাউসে প্লাস্টিকের প্রভাব :** আমরা যে সমস্ত প্লাস্টিক বোতল দেখি তার মূল উপাদান হলো পলিইথিলিন। গবেষণায় দেখা গেছে এক আউন্স পলিইথিলিন তৈরি করতে গেলে পাঁচ আউন্স কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস নির্গত হয়। অর্থাৎ আমরা যে পরিমাণ প্লাস্টিকদ্রব্য প্রস্তুত করছি তার চেয়ে বেশি পরিমাণ দূষিত পদার্থ বায়ুতে নির্গমন করছি। শিল্পোন্নত দেশগুলোতে বিভিন্ন পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য প্লাস্টিকের চাহিদা ব্যাপক। ফলে এটা খুব সহজেই অনুমান করা যায় যে, শিল্পোন্নত দেশগুলো শিল্পায়নে বাজিমাৎ করতে গিয়ে কী পরিমাণ পরিবেশ দূষণ করেছে।
৬. **সামুদ্রিক পরিবেশ দূষণে প্লাস্টিকের প্রভাবঃ**

- বিশ্বে উৎপাদিত প্লাস্টিকের প্রায় ২% সরাসরি মহাসাগরে পৌঁছে সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের ওপর মারাত্মক চাপ তৈরি করেছে।
- ১৯৫০-২০১৫ সময়ে ৮.৩ বিলিয়ন টন প্লাস্টিক তৈরি হয়েছে; এর মধ্যে ৩০% এখনো ব্যবহারে, ১০% পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে, আর ৬০% পরিবেশে ছড়িয়ে রয়েছে-এর বড় অংশই সমুদ্রে জমা পড়ছে।
- সস্তা হওয়ায় সিনথেটিক ফাইবার-সমৃদ্ধ পোশাক থেকেও মাইক্রোফাইবার সমুদ্রে যাচ্ছে, দূষণ বাড়ছে।
- বাস্তুব উদাহরণ: সিয়াটল সৈকতে মৃত তিমির পাকস্থলীতে বহু প্লাস্টিক পাওয়া যায়-প্লাস্টিকই মৃত্যুর সম্ভাব্য কারণ।
- জাতিসংঘের তথ্য: প্রতি বছর ৮০০ প্রজাতির সামুদ্রিক প্রাণী সমুদ্রের বর্জে আক্রান্ত হয়; এই বর্জের প্রায় ৮০% প্লাস্টিক।
- গবেষণা বলছে, প্রায় অর্ধেক সামুদ্রিক কচ্ছপ প্লাস্টিক গলাধঃকরণ করে, যা তাদের মৃত্যু ও প্রজননে বাধা সৃষ্টি করছে।

স্বাস্থ্যগত প্রভাব

■ পরিযায়ী পাখিদের উপর প্লাস্টিকের ক্ষতিকর প্রভাব

গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, প্রতিবছর প্রায় ১০ লাখ পাখি প্লাস্টিক দূষণের শিকার হচ্ছে। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, প্রায় ৯০ শতাংশ পরিযায়ী পাখির পাকস্থলীতে পাওয়া গেছে প্লাস্টিকজাত বিভিন্ন অপাচ্য দ্রব্য। বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন ২০৫০ সাল নাগাদ প্রায় ৯৯ শতাংশ পরিযায়ী পাখির পাকস্থলীতেই প্লাস্টিক পাওয়া যাবে, যা এসব পাখির অস্তিত্বে বিরাট বড় এক বাঁধা।

■ মানবদেহে প্লাস্টিকের ক্ষতিকর প্রভাব

প্লাস্টিক পরিবেশের পাশাপাশি মানবস্বাস্থ্যের ওপরও প্রভাব বিস্তার করে আসছে। প্লাস্টিক উৎপাদনে ব্যবহৃত উপাদান মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। মূলত তিন পদ্ধতিতে প্লাস্টিক মানবদেহে প্রবেশ করে। সাধারণ রিবেশ যেমন বাতাস ও পানির মধ্য দিয়ে, খাবার খাওয়ার ফলে (যেসকল প্রাণী প্লাস্টিক খেয়ে ফেলে যেমন- মাছ এবং প্লাস্টিক পণ্যগুলোর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় পাওয়া গেছে যে, আমাদের শরীরে যে পরিমাণ মাইক্রোপ্লাস্টিক আছে তা দিয়ে একটি ক্রেডিট কার্ড তৈরী করা যাবে। এর ফলে সব থেকে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের মস্তিষ্ক বাড়ছে বিবিধ রোগ-ব্যাদি।



পলি ভিনাইল ক্লোরাইড বা পিভিসি প্লাস্টিক পদার্থগুলো হলো-প্রসাধনী সামগ্রী রাখার পাত্র, খেলনা, পানির পাইপ, টাইলস, গৃহসজ্জার সামগ্রী, শিশুদের সুইমিং পুল ইত্যাদি। এগুলো দীর্ঘদিন ব্যবহারের কারণে ক্যান্সার, জন্মগত ত্রুটি, জেনেটিক পরিবর্তন, দীর্ঘস্থায়ী ব্রংকাইটিস, আলসার, বধিরতা, চর্মরোগ, লিভার সমস্যা হতে পারে।

থ্যালোট বা পাস্টিসাইজারজাত প্লাস্টিক যেমন- জুতা, ছাপার কালি, চিকিৎসা ও ল্যাবরেটরির সরঞ্জামাদি প্রভৃতি। এগুলো ব্যবহার করলে হাঁপানি, ক্যান্সার জন্মত্রুটি, হরমোন পরিবর্তন, গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা হ্রাস, বন্ধ্যাত্ব, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দেয়। পানির বোতল তৈরি হয় বিসফেনল নামক প্লাস্টিক থেকে। এটি ব্যবহার করলে ক্যান্সার, প্রতিবন্ধী প্রবণতা, দ্রুত বয়ঃসন্ধি, স্থূলতা, ডায়াবেটিস প্রভৃতি রোগ হতে পারে।

পানির ও দই রাখার পাত্র, ফোম ও শক্ত পেট, অডিও ক্যাসেট হাউজিং, সিডি কেস, বিল্ডিং ইনসুলেশন, বরফের ছাঁচ, দেয়ালের টাইলস, ট্রে প্রভৃতিতে পলিস্টাইরিন থাকে। এসব তৈরির কারখানার শ্রমিকদের চোখে জ্বালাপোড়া, নাক ও গলায় অস্বস্তি, মাথা ঘোরা, অচেতনতা ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়।

ইলেক্ট্রনিক বর্জ্য (E-Waste)



বাংলাদেশের পরিবেশ অধিদপ্তরের অর্থায়নে পরিবেশ ও সম্পদ ব্যবস্থাপন এবং বুয়েট কর্তৃক ২০১৮ সালে পরিচালিত সমীক্ষা মতে, ২০১৬ ও ২০১৮ সালে বাংলাদেশে ই-বর্জ্যের আনুমানিক পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩ লাখ ১০ হাজার ও ৪ লাখ টন। প্রতিবছর ই-বর্জ্যের পরিমাণ বাড়ছে ৩০ শতাংশ করে, যা ২০৩৫ সালে গিয়ে পৌঁছাবে ৪৬ লাখ ২০ হাজার টনে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি ই-বর্জ্য উৎপাদিত হয় জাহাজ ভাঙা শিল্প থেকে। এটি দেশে উৎপাদিত মোট ই-বর্জ্যের ৮০ শতাংশ। বাকি ২০ শতাংশ উৎপাদিত হচ্ছে মোবাইল, ল্যাপটপ, ফ্রিজ, এসি ইত্যাদি পণ্য থেকে। বিভিন্ন দেশ থেকে ভাঙার জন্য আনা পুরানো জাহাজগুলোতে সে সব দেশের ই-পণ্য বা ইলেক্ট্রনিক বর্জ্য বিদ্যমান থাকে। জাহাজ ভাঙার সময় এবং তৎপরবর্তীতে এসব বিষাক্ত ই-বর্জ্য মাটি ও পানিতে মিশে চক্রাকারে মানুষের শরীরে প্রবেশ করছে। দুঃখজনক হলেও সত্য, দেশে প্রতি বছর হাজার হাজার টন ই-বর্জ্য তৈরি হলেও রিসাইক্লিং হয় মাত্র ১৩ হাজার ৩০০ টন। ফলে, বিপুল পরিমাণ বর্জ্য অব্যবস্থাপিত থেকে যাচ্ছে।

১৫ জুন ২০২১ প্রকাশিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বৈশ্বিক প্রতিবেদনে ই-বর্জ্যের অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী লাখ লাখ শিশু, কিশোর-কিশোরী এবং গর্ভবতী মায়াদের কার্যকর ও বাধ্যতামূলকভাবে রক্ষা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালককে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, পৃথিবীজুড়ে 'ই-বর্জ্যের সুনামি' চলছে। মানুষের জীবন স্বাস্থ্য ঝুঁকির মুখে পড়ছে। একই

সঙ্গে প্লাস্টিক ও মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণের বিপরীতে সমুদ্র এবং তার জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সারা বিশ্ব সরব। সংস্থাটির হিসাবে, বিশ্বের ১ কোটি ২৯ লাখ নারী অপ্রাতিষ্ঠানিক বর্জ্য খাতে নিয়োজিত। এ সংখ্যক নারী ও তাদের অনাগত সন্তানদের বিষাক্ত ই-বর্জ্য দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। পাশাপাশি অন্তত ১ কোটি ৮০ লাখ শিশু-কিশোরের একটা বড় অংশের বয়স পাঁচ বছরের নিচে, যারা সক্রিয়ভাবে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প খাতের সঙ্গে জড়িত। (বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আধুনিক উদ্যোগ, ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী, জনকণ্ঠ, ৩০ মে ২০২৫)

পরিবেশ ও মানবস্বাস্থ্যের উপর প্রভাব

বিশেষজ্ঞদের মতে, ইলেকট্রনিক্স সরঞ্জামের মধ্যে সিসা, সিলিকন, টিন, ক্যাডমিয়াম, পারদ, দস্তা, ক্রোমিয়াম, নাইট্রাস অক্সাইড প্রভৃতি রাসায়নিক থাকে, যেগুলো দেশের মাটি ও পানিকে দূষিত করছে। নানাভাবে তা মানুষের শরীরে প্রবেশ করে বিভিন্ন রোগের বিশেষ করে গর্ভবতী মা ও শিশুদের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে।

- বাতাস, মাটি ও পানিতে দূষণঃ অপরিবর্তিতভাবে ই-ওয়েস্ট ডাম্পিং বা পোড়ানোর ফলে বাতাসে, মাটিতে ও পানিতে বিষাক্ত পদার্থ প্রবেশ করে। উদাহরণস্বরূপ, ই-ওয়েস্ট থেকে নির্গত লীড, ক্যাডমিয়াম, মেরকুরি মাটির জীববৈচিত্র্যে, চাষের জমি ও ভূগর্ভস্থ পানিতে ক্ষতিকারক হারে প্রবেশ করে।

- মানবদেহে প্রবেশ ও ক্ষতিকারক প্রভাবঃ এসব বিষাক্ত ধাতু খাবার, পানিসহ খাদ্যচক্রের মাধ্যমে মানবদেহে পৌঁছাতে পারে-যেমন মাছ, শস্য ও শাকসব্জিতে সঞ্চিত হতে পারে। ফলস্বরূপ কিডনি, লিভার, স্নায়ুতন্ত্র ও হরমোন নিয়ন্ত্রিত অংশে মারাত্মক প্রভাব দেখা দিয়েছে। শিশুদের ক্ষেত্রে বিশেষ ঝুঁকি রয়েছে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হতে পারে। ই-বর্জ্যের কারণে অপরিণত শিশুর জন্ম নেওয়া, ওজন কম হওয়া এবং মৃত শিশু



জন্মের ঘটনাও ঘটছে। ই-বর্জ্যের সিসা নবজাতকের স্নায়ুতন্ত্রে মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে। শিশু বড় হলে শ্বাসতন্ত্র, থাইরয়েড জটিলতা, ক্যান্সার এবং হৃদরোগের মতো বড় রোগের জটিলতাও দেখা দিতে পারে।

বিষাক্ততার উদাহরণ

মাত্র ১ গ্রাম পারদ প্রায় ১,০০০ লিটার পানি দূষিত করতে পারে-এটি শুধু একটি উদাহরণ হলেও আমাদের নদী ও ভূগর্ভস্থ পানির জন্য ভয়াবহ। আমাদের শিল্পাঞ্চল যেমন মিরপুর, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রাম-এর মতো এলাকায় অবাধ ই-ওয়েস্ট ফেলানোর কারণে বাস্তব হুমকির মুখে পড়েছে বলে গবেষণা দেখায়। (EBAUB)

ই-ওয়েস্ট একটি প্রযুক্তিগত সুবিধার ফল হলেও, ভুলভাবে ব্যবহৃত হলে এটি হয়ে ওঠে পরিবেশ ও মানবজীবনের ভয়ের এক হাতিয়ার। আমরা যদি আজই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ না নেই-সংগ্রহ থেকে রিসাইক্লিং, সচেতনতাহীনতা থেকে সক্রিয় অংশগ্রহণ-তাহলে এই ঝুঁকি আগামী দিনে আরও গভীর হবে। বাংলাদেশে ইতিমধ্যে চিহ্নিত হয়েছে হুমকি; এখন সময় এসেছে সুব্যবস্থাপনা ও নির্ভরযোগ্য বিকল্প গড়ার।

সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি

প্লাস্টিক, জৈব ও ই-বর্জ্য-এই তিন ধরনের বর্জ্য আজ বাংলাদেশের পরিবেশের তিনটি স্তরকে (বায়ু, মাটি ও পানি) সমানভাবে হুমকির মুখে ফেলেছে। যদি সমন্বিত নীতি, প্রযুক্তি এবং নাগরিক সচেতনতা একত্রে প্রয়োগ করা যায়, তাহলে এই বর্জ্যগুলোই সম্পদে রূপান্তরিত হতে পারে- যা টেকসই বাংলাদেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

অধ্যায়-২
বর্জ্য ব্যবস্থাপনায়
সফলতার গল্প





২.১ এসডিসি'র উদ্যোগঃ পরিচ্ছন্ন শহর গড়ার যাত্রা

ভূমিকা

বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নগর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, সীমিত পৌর সম্পদ ও দ্রুত নগরায়নের কারণে স্থানীয় সরকারগুলোর জন্য টেকসই সমাধান খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে। এই প্রেক্ষাপটে দেশের দক্ষিণাঞ্চলভিত্তিক উন্নয়ন সংস্থা সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (এসডিসি) ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচী ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক প্রকল্পের পাশাপাশি ২০১৬ সাল থেকে বাংলাদেশের নগর বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। টেকসই ও কার্যকর সমাধানের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে সংস্থাটি ফরিদপুর পৌরসভা এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা Practical Action-এর সঙ্গে অংশীদারিত্বে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) মডেলে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজ শুরু করে। যেখানে ফরিদপুর পৌরসভা মালিক পক্ষ হিসেবে সার্বিক তত্ত্বাবধানের কাজ করছে, Practical Action প্রদান করেছে কারিগরী ও অবকাঠামো তৈরীর সহযোগিতা। আর এসডিসি সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে একটি লাভজনক ব্যবসা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে যাবতীয় কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় সংস্থাটি ২০১৭ সালে উক্ত পিপিপি মডেলে ফরিদপুরে শুরু করে ইন্টিগ্রেটেড সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট (ISWM) কর্মসূচি। বর্তমানে এসডিসি ০৪ টি পৌরসভায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে।

সূচনা: ফিক্যাল স্লাজ ম্যানেজমেন্ট (FSM)

যাত্রার শুরুটা ছিল ফিক্যাল স্লাজ ম্যানেজমেন্ট (FSM) নিয়ে-একটি জটিল কিন্তু জরুরি নগর চ্যালেঞ্জ; কিন্তু পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ সেবা কার্যক্রম (সার্ভিস চার্জ) এসডিসি'র আওতাভুক্ত না থাকায় এবং এটা থেকে উৎপাদিত সারের প্রতি মানুষের নেতিবাচক মনোভাব থাকায় এই কার্যক্রমটি এককভাবে লাভজনক হয়নি।

কৌশলগত মোড়: সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট (SWM)

২০১৭ সালে ফরিদপুর পৌরসভার দরপত্রে অংশগ্রহণ করে এসডিসি শীর্ষস্থান দখল করে। তখন থেকে পয়ঃবর্জ্য ট্রিটমেন্ট করার পাশাপাশি এসডিসি শুরু করে গৃহস্থালি কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ, বাছাই ও প্রক্রিয়াকরণ। প্রথম থেকেই উদ্যোগ নেয়া হয় যেন এই কার্যক্রমটি কোনো ধরনের অনুদান ছাড়া একটি সম্ভাবনাময় ও লাভজনক ব্যবসা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করে ফরিদপুর পৌরসভা ও প্রাক্টিক্যাল অ্যাকশন। গ্রহণ করা হয় প্রতি মাসের আয় থেকেই পুনঃবিনিয়োগের কৌশল। এভাবেই তৈরি হয় পাঁচ বছর মেয়াদি কৌশল ও ব্যবসায়িক পরিকল্পনা, যার ওপর দাঁড়িয়ে গড়ে ওঠে একটি দক্ষ ও নিবেদিত টিম। ধীরে ধীরে কার্যক্রমটি হয়ে ওঠে একটি লাভজনক ব্যবসায়িক উদ্যোগ; যা বর্জ্যকে সম্পদে পরিনত করার তথা বর্জ্য থেকে আয় করার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

সেবার বহুমাত্রিকতা: স্বাস্থ্যবর্জ্য থেকে প্লাস্টিক বর্জ্য পুনর্ব্যবহার

স্বাস্থ্যবর্জ্য ব্যবস্থাপনাঃ ২০১৭ সালের শেষের দিকে গৃহস্থালী বর্জ্য, পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত হয় মেডিক্যাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম। এটা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে দ্রুত লাভে পৌঁছাতে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। বর্তমানে ১০৫টি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে বর্জ্য সংগ্রহ ও নিরাপদ নিষ্পত্তির মাধ্যমে শহরের স্বাস্থ্যঝুঁকি কমানোর প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে এসডিসি।

প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট: ২০২৩ সালে Danish Ministry of Foreign Affairs (DMFA) আর্থিক সহযোগিতায়, River Recycle (RR) I Practical Action (PA)-এর সহায়তায় Danida Market Development Partnerships (DMDP) Project এর আওতায় এসডিসি ফরিদপুরে শুরু করে Single Use Polythene (SUP) পুনর্ব্যবহারের প্রকল্প, Increasing employment by creating value from plastic waste in Bangladesh। যেখানে স্থানীয় ভান্জারী কো-অপারেটিভ সোসাইটির সাথে চুক্তির মাধ্যমে পাতলা পলিথিন ক্রয় করা হয়। এরপর দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আনা হয় উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন পলিথিন থেকে পাইরোলাইসিস অয়েল তৈরীর মেশিন। সৃষ্টি হয় পাতলা পলিথিনের বাজার মূল্য। যেগুলো প্রক্রিয়াজাত করে পাওয়া যায়-

- ৭০% পাইরোলিসিস অয়েল, যা ডিজেলের পরিবর্তে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- ২৫% কার্বন, যা প্রিন্টিং শিল্পে ব্যবহারযোগ্য।



এভাবে ক্ষতিকর প্লাস্টিক বর্জ্যে পরিণত হচ্ছে চক্রাকার অর্থনীতির সম্পদে।

পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জীবনমান উন্নয়ন

উপোরোক্ত কার্যক্রমের পাশাপাশি ২০২৩ সালে Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF)-এর আর্থিক সহযোগিতায় Practical Action (PA)-এর সহায়তায় এসডিসি দেশের ১১টি পৌরসভায় শুরু করে পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের মর্যাদাপূর্ণ জীবন প্রদানের লক্ষ্যে Towards a dignifying life for all sanitation workers in Bangladesh প্রকল্প। যেখানে ১১টি পৌরসভা (ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মাগুরা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, কলারোয়া, বরগুনা, গাজীপুর, জয়দেবপুর, কলাপাড়া ও লাকসাম)-র ৬০টি কো-অপারেটিভস (সম্ভাব্য সদস্য সংখ্যা ৩০০০ জন) সদস্যদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঘটাতে বিবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। যেমনঃ একত্রীকরণ, কমিটি গঠন, সমবায় সমিতি গঠন ও সনদ গ্রহণ, ব্যংক হিসাব খোলা ও সঞ্চয়মুখী করা, স্বাস্থ্য ও মানবাধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ, Advocacy ইত্যাদির।



বর্তমান পরিসর ও প্রভাব

আজ এসডিসি চার ধরনের বর্জ্য-গৃহস্থালি, স্বাস্থ্যবর্জ্য, প্লাস্টিক ও পয়ঃবর্জ্য-সম্বিতভাবে পরিচালনা করছে।

৬০ জনের নিবেদিত টিম নিয়মিত সেবা দিচ্ছে

- ১০,৫০০টি পরিবারে
- ১০৫টি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে।

কৃষিক্ষেত্রে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

এসডিসি সকল উন্নয়ন প্রকল্পে (বিশেষ করে কৃষি বিষয়ক) যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করছে। যেমনঃ নিরাপদ সবজি, ফল ও সাধারণ কৃষি ফসল উৎপাদনের প্রকল্পে Resource Efficiency and Cleaner Production (RECP) এর প্রাক্টিস করানো হচ্ছে কৃষকদের; যেখানে-কৃষক তার কৃষি বর্জ্য (যেমন-সার ও কীটনাশকের প্যাকেট, বস্তা, বোতল; সবজি বা ফসলের অপ্রয়োজনীয় অংশ ও গাছ ইত্যাদি) যেখানে-সেখানে না ফেলে অজৈব বর্জ্য একস্থানে জমা রেখে ভাস্করীওয়ালাদের নিকট বিক্রি, জৈব অংশ কেটে কেটে ক্ষুদ্র করে ফসলের জমির একপ্রান্তে অথবা বসত বাড়ীর ভিতায় গর্ত করে (অন্যান্য উপাদান-গোবর, হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা, ছাই, সামান্য পানি ইত্যাদি সহ) ফেলে জৈব সার উৎপাদন করানো হচ্ছে; যা সে তার কৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহার করে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমাচ্ছে। তাছাড়া, গাভীপালনের প্রকল্পসমূহ সহ অন্যান্য অনেক প্রকল্পে খামারীদের গোবর থেকে কেঁচো সার উৎপাদন করানো হচ্ছে। শুধুমাত্র গোবর নয়, হাঁস-মুরগি পালনের প্রকল্পে হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা থেকে ট্রাইকো কম্পোষ্ট এবং গোবর ও হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা সম্মিলিত করে কেঁচো সার উৎপাদন করা হচ্ছে।





বর্জ্য থেকে সম্পদ

গৃহস্থালি বর্জ্যঃ প্রতিদিন ফরিদপুরে ২৪টি তিন চাকা ভ্যানের মাধ্যমে সংগৃহীত ২৫-৩০ মেট্রিক টন গৃহস্থালি বর্জ্যের জৈব অংশ থেকে উৎপাদিত বায়ো-ফার্টলাইজার (জাতীয় মানদণ্ডে পরীক্ষিত) স্থানীয় কৃষকদের কাছে বিক্রি হচ্ছে। যা তারা নিরাপদ ফসল (বিশেষ করে সবজি) উৎপাদনে ব্যবহার করছে।



প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ



প্লাস্টিক বর্জ্য থেকে পাইরোলাইসিস প্লান্টে উৎপাদিত তেল



প্লাস্টিক বর্জ্য পাইরোলাইসিস প্লান্টে প্রসেসিং



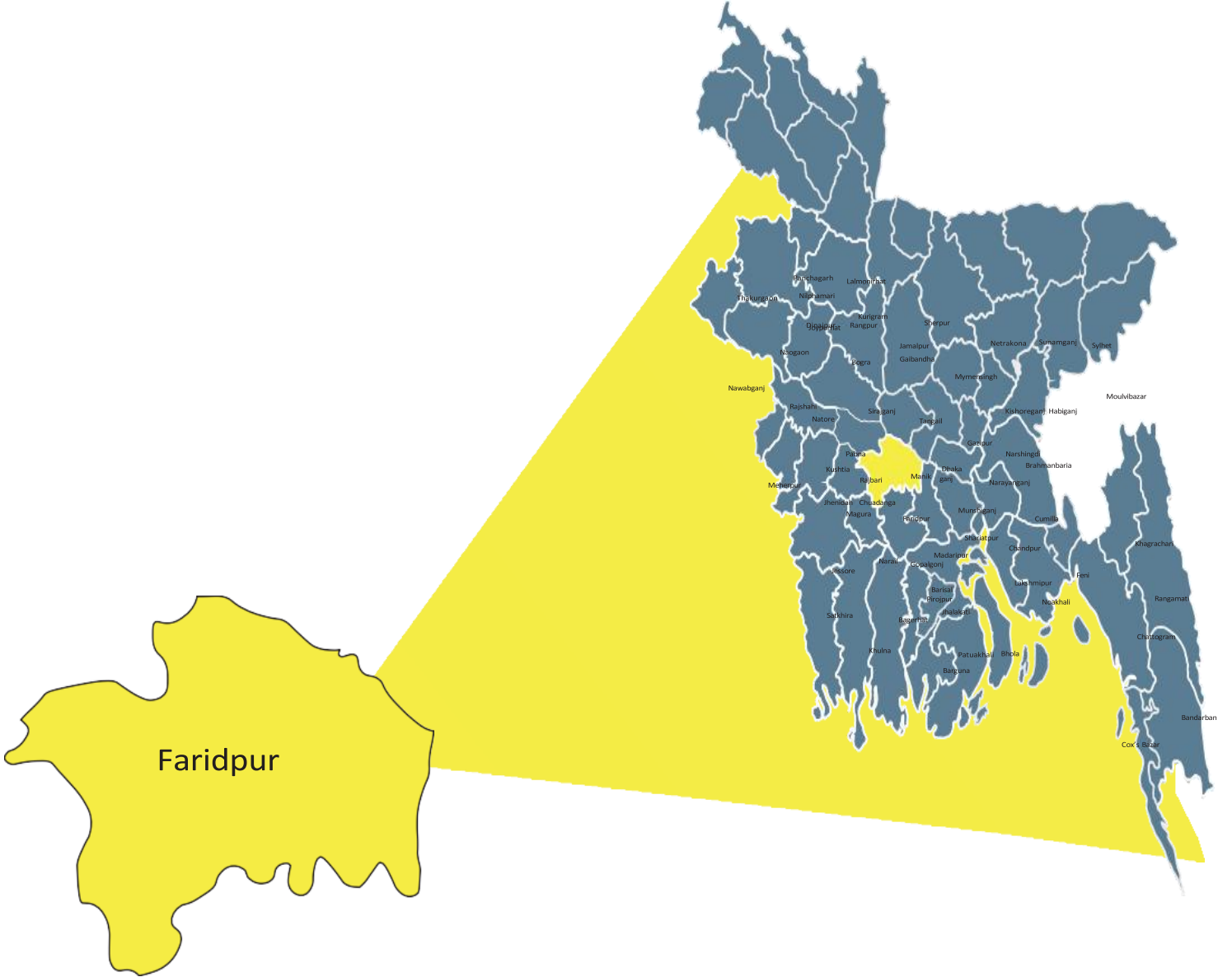
উৎপাদিত তেল স্যালো মেশিনে ব্যবহার

প্লাস্টিকজাত বর্জ্যঃ প্লাস্টিকজাত বর্জ্য বাছাই করে পাঠানো হচ্ছে পাইরোলাইসিস প্লান্টে রিসাইক্লিং এর উদ্দেশ্যে।^{বর্জ্য} সৈগুন্ডো রিসাইক্লিং করে তৈরী করা হয়-

- পাইরোলাইসিস তেল ও কার্বন উৎপাদন করা হয় (পাতলা পলিথিন থেকে)
- শো-পিস ও আসবাবপত্র (প্লাস্টিকের বোতল থেকে)

টেকসই অর্থায়ন মডেল

এসডিসির পুরো কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে পরিবার-ভিত্তিক সেবা-ফি মডেলে-যেখানে প্রতিটি পরিবার প্রতি মাসে বর্জ্য সংগ্রহের সার্ভিস চার্জ ১৫০-২০০ টাকা পরিশোধ করে। এই আয় থেকেই পরিচালনা ব্যয়, কর্মীদের ন্যায্য মজুরি এবং ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ নিশ্চিত হয়। কোনো বাইরের তহবিল ছাড়া এমন একটি স্ব-অর্থায়িত ও টেকসই নগর মডেল বাংলাদেশে বিরল উদাহরণ।



সম্প্রসারণ: ফরিদপুর থেকে সারাদেশে

ফরিদপুরের সাফল্য ছড়িয়ে পড়ছে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে।

- বরগুনা ও মাগুরা পৌরসভায় কার্যক্রম শুরু হয়েছে ২০২৫ সালের জানুয়ারী মাস থেকে।
- চাঁপাইনবাবগঞ্জে ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে সূচনার পরিকল্পনা চলছে।

পাশাপাশি আগামী পাঁচ বছরে আরও ২০টি পৌরসভায় সম্প্রসারণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে-যেখানে প্রতিটি শহরে থাকবে সম্পূর্ণ গৃহস্থালি কভারেজ ও সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা।

কৃষিতে সংযোগ: শহরের বর্জ্য, মাটির প্রাণ

এসডিসির উৎপাদিত কম্পোস্ট সার পুষ্টিসমৃদ্ধ ও মাটিবান্ধব হিসেবে পরীক্ষিত। কৃষকেরা বলছেন, এই সারের ব্যবহার জমির উর্বরতা বাড়াচ্ছে এবং ফলনও উন্নত হচ্ছে। ফলে শহরের বর্জ্য এখন গ্রামের কৃষিতে নবজীবন যোগাচ্ছে-একটি প্রকৃত শহরগ্রাম সংযোগের সবুজ সেতু।

আর্থিক মডেলের বিশেষণ

এই মডেলটির সাফল্যের পেছনে তিনটি মূল স্তর কাজ করছে

১. অপারেশনাল দক্ষতা (Operational Efficiency):
 - প্রশিক্ষিত কর্মী, নির্ধারিত রুট ও সময়মাত্রিক সংগ্রহ কার্যক্রম।
 - স্থানীয় সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার।
২. কমিউনিটি অংশগ্রহণ (Community Engagement):
 - নাগরিকরা সেবা-ফি প্রদান করে অংশীদার হিসেবে যুক্ত।
 - সচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে সেবার মান বাড়ানো।
৩. ব্যয় পুনরুদ্ধার কাঠামো (Cost Recovery):
 - প্রত্যেক সেবার জন্য নির্ধারিত মূল্য।
 - পুনর্ব্যবহারযোগ্য বর্জ্য বিক্রির মাধ্যমে আয়-বৈচিত্র্য সৃষ্টি।

সামাজিক প্রভাব

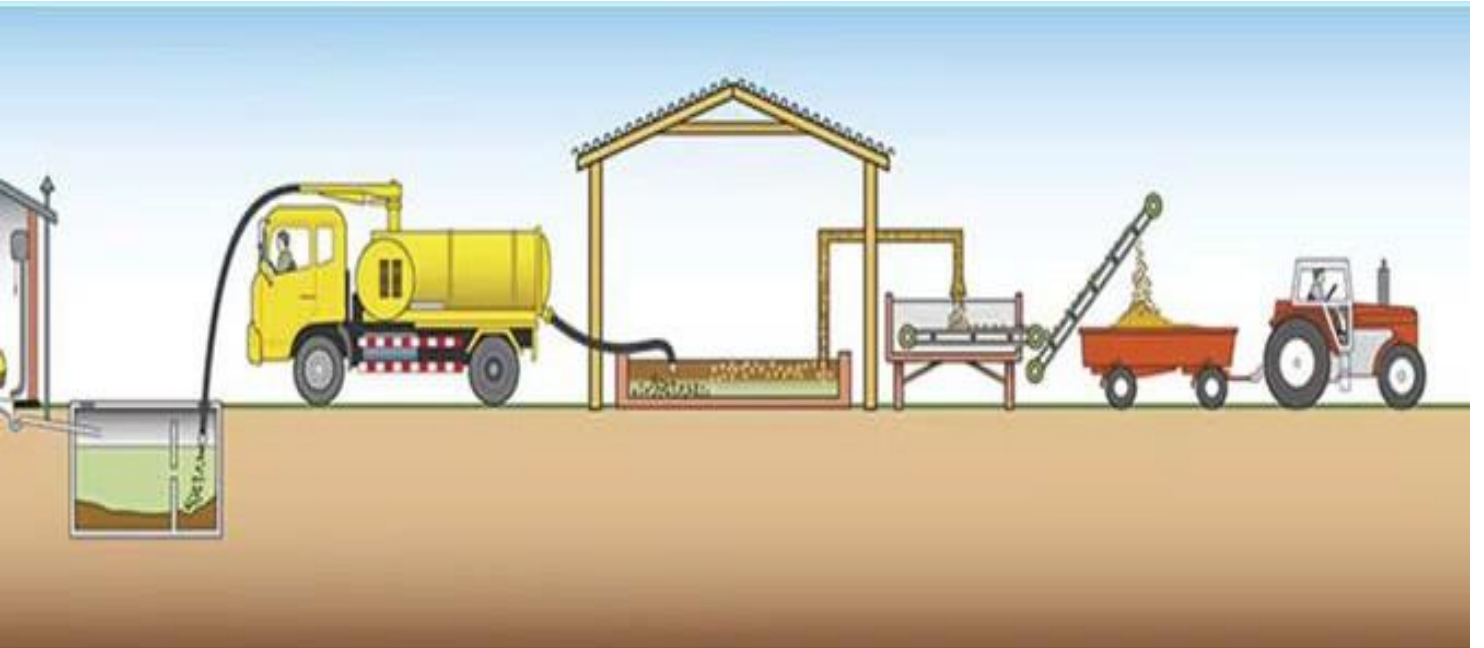
পরিবেশগত টেকসইতার বাইরেও, এসডিসির বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উদ্যোগ বস্তিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনে এনেছে এক ইতিবাচক পরিবর্তন। যে মানুষগুলো একসময় অনিশ্চিত, ঝুঁকিপূর্ণ কিংবা সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে ছিল, আজ তারা হয়ে উঠেছে পরিচ্ছন্ন নগর গড়ার কর্মযোদ্ধা। এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তারা পেয়েছে

- নিয়মিত ও স্থিতিশীল কর্মসংস্থান,
- মর্যাদাপূর্ণ আয়ের উৎস, এবং
- উন্নত জীবনমানের সুযোগ।

এসডিসি এসব মানুষকে সংগঠিত করে শুধু কাজের সুযোগই দেয়নি, দিয়েছে নতুন পরিচয় ও আত্মসম্মানের অনুভব। এর ফলে বস্তি এলাকায় অপরাধ প্রবণতা কমেছে, সামাজিক নিরাপত্তা বেড়েছে, এবং নাগরিক দায়িত্ববোধের একটি নতুন সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। এইভাবে, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পটি শুধুমাত্র একটি পরিবেশগত কর্মসূচি নয়-এটি এক মানবিক পুনর্জাগরণের উদ্যোগ, যেখানে কর্ম, দক্ষতা ও সম্মানের মাধ্যমে প্রান্তিক মানুষরা ফিরে পাচ্ছে সমাজে নিজেদের প্রাপ্য স্থান।

পরিবেশগত প্রভাব

- ফিক্যাল স্লাজ নিরাপদভাবে ট্রিটমেন্ট করে ও জৈব বর্জ্য প্রক্রিয়াজাত করে বায়ো-ফার্টিলাইজার উৎপাদনের মাধ্যমে



চক্রাকার অর্থনীতি (Circular Economy)-তে অবদান রাখার পাশাপাশি পরিবেশকে এসব বর্জ্য দ্বারা ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করছে।

শহরের মানুষ এর সুফল ভোগ করছে।

- প্লাস্টিক ও অজৈব বর্জ্য রিসাইক্লিংয়ের ফলে ল্যান্ডফিলে চাপ কমেছে এবং সেসব দ্বারা পরিবেশ রক্ষা পাচ্ছে।
- শহরের অবৈধ বর্জ্য ফেলার স্থানকে উচ্ছেদ করে সেখানে ফুলের বা সবজির গাছ লাগানো হচ্ছে। ফলে আস্তে আস্তে শহরের পরিবেশ উন্নততর হচ্ছে।

ফরিদপুর মডেল: শেখার অনন্য উদাহরণ

২০১৭ সাল থেকে গড়ে ওঠা ফরিদপুরের ISWM মডেল আজ একটি উত্তম অনুশীলনের মানদণ্ড। এখানে তিন পক্ষের সমন্বয়ই সাফল্যের চাবিকাঠি

- স্থানীয় সরকার দিয়েছে নীতিগত সহায়তা,
- এনজিও ও প্রাইভেট খাত নিশ্চিত করেছে দক্ষতা ও উদ্ভাবন,
- নাগরিকরা দিয়েছে অর্থায়ন ও অংশগ্রহণ।

এই সমন্বিত প্রয়াসই তৈরি করেছে এক দীর্ঘস্থায়ী, পুনরাবৃত্তিযোগ্য নগর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা মডেল। যেখানে-

- দাতা-নির্ভরতা কমানো গেছে,
- নাগরিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে,
- এবং আর্থিক স্বনির্ভরতার মাধ্যমে সেবার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে।

এই মডেলটি আন্তর্জাতিকভাবে কমিউনিটি-চালিত আরবান এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট মডেল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

উপসংহার: বাংলাদেশের জন্য এক টেকসই পাঠ

এসডিসি প্রমাণ করেছে-কমিউনিটি-নির্ভর, উদ্ভাবনী ও স্বনির্ভর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একসাথে পরিবেশ, অর্থনীতি ও সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। প্লাস্টিক রিসাইক্লিং থেকে জৈব সার উৎপাদন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি থেকে নাগরিক অর্থায়ন-সব মিলিয়ে এটি এক বাংলাদেশি উদ্ভাবন, যা অন্য শহরগুলোতেও সফলভাবে প্রয়োগযোগ্য।

এসডিসির লক্ষ্য :

পরিচ্ছন্ন শহর, উন্নত জনস্বাস্থ্য, নতুন কর্মসংস্থান এবং নাগরিক-অংশগ্রহণে গড়ে ওঠা একটি সবুজ ও টেকসই বাংলাদেশ। এটি কেবল একটি প্রকল্প নয়-এটি একটি আন্দোলন, যার মূল বার্তা একটাই:

প্রত্যেক নাগরিকই পরিবর্তনের অংশীদার।

২.২ ওয়াকারহোলিক এর উদ্যোগঃ বর্জ্য থেকে সম্পদ

ভূমিকা

Workaholic BD এবং SDC-এর যৌথ উদ্যোগে Waste to Resource Program শুরু হয়; যার মূল উদ্দেশ্য ছিল ক্রমবর্ধমান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করা এবং একই সঙ্গে টেকসই জীবিকায়ন তৈরি করা। প্রকল্পটি স্থানীয় তরুণ-তরুণীদের, বিশেষ করে নারীদের, বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত ও ক্ষমতায়িত করতে ডিজাইন করা হয়। এ উদ্যোগটি Rural Microenterprise Transformation Project (RMTP)-এর অংশ হিসেবে চালু হয়। RMTP প্রকল্প সক্ষমতা-বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ, কমিউনিটি সম্পৃক্ততা,



তরুণদের উদ্ভাবন প্র্যাটফর্ম, কারিগরি সহায়তা ও সিড-ফাউন্ডিংয়ের মাধ্যমে এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা দেয়-ফলে ভাবনা থেকে বাস্তবায়ন এবং বাজারে বিক্রিযোগ্য বজর্য-ভিত্তিক পণ্য পরীক্ষা করা সম্ভব হয়। কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল সচেতনতা প্রচারণা, বজর্য সংগ্রহ এবং বজর্য-উৎপন্ন বাজারযোগ্য পণ্য তৈরির কাজ।

প্রকল্পের যাত্রা

প্রথম ধাপে কমিউনিটি সচেতনতা ও সক্ষমতা-বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়; স্থানীয় তরুণ ও নারীদের বজর্য আলাদা করা ও রূপান্তর-প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এরপর Workaholic একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করে-যেখানে উদ্ভাবনী আইডিয়া ও বজর্য ব্যবস্থাপনা-সমাধান উপস্থাপনের সুযোগ দেওয়া হয়;এতে স্থানীয় অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্ততা বাড়ে। Workaholic BD স্থানীয় ব্যবসা ও উৎপাদন-সহযোগীদের সঙ্গে অংশীদারিত্ব করে বজর্য-উৎপন্ন পণ্য বানানো শুরু করে। প্রাথমিক পণ্যসমূহ ছিল: কম্পাস্ট, পরিবেশবান্ধব ব্যাগ এবং সাজসজ্জার সামগ্রী যা বজর্য থেকে প্রস্তুত। পণ্যগুলো অনলাইন প্র্যাটফর্ম (সোশ্যাল মিডিয়া ও ওয়েবসাইট)-এর মাধ্যমে স্থানীয় কমিউনিটির বাইরেও বাজারজাত করা হয়।



বর্তমান অবস্থা

বজর্য সংগ্রহ ও পণ্য উন্নয়নে উলেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও চাহিদা সৃষ্টি বড় একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। অনলাইন স্টোর ও সোশ্যাল মিডিয়া সক্রিয় থাকলেও বড় গ্রাহকভিত্তি তৈরি করা কঠিন হয়েছে-বিশেষ করে এমন এলাকায় যেখানে ভোক্তারা পরিবেশবান্ধব পণ্যের উপকারিতা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত নন, বা কেনাকাটায় স্থায়ীত্বকে অগ্রাধিকার দেন না। এই প্রেক্ষিতে Workaholic BD পণ্যের বৈচিত্র্য আনার কথা বিবেচনা করছে-রিসাইকেল করা প্লাস্টিক ও অন্যান্য বজর্য থেকে প্লাস্টিক বোর্ড, ফার্নিচার ইত্যাদি তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে গৃহস্থালি থেকে নির্মাণ-খাত পর্যন্ত বড় বাজারের চাহিদা পূরণ করা যায়-তবে পরিবেশবান্ধব মূল্যবোধ বজায় রেখেই উৎপাদন স্কেলআপ করা হবে।

চ্যালেঞ্জসমূহ

- **চাহিদা সৃষ্টি:** ভোক্তা-সচেতনতার ঘাটতি এবং সম্ভ্র, অ-পরিবেশবান্ধব পণ্যের প্রতি ঝোঁকের ফলে পুনর্ব্যবহৃত পণ্যের ধারাবাহিক চাহিদা তৈরি করা কঠিন হয়েছে।
- **বাজার সম্প্রসারণ:** স্থানীয় বাজারের বাইরে যেতে অনলাইন প্র্যাটফর্ম তৈরি করা হলেও লজিস্টিক, ডেলিভারী এবং প্রচারণার সীমাবদ্ধতা বাজার সম্প্রসারণে বাঁধা সৃষ্টি করেছে।
- **উৎপাদন খরচ:** শাস্ত্রীয় দামে স্কেল-আপ কঠিন-ধারাবাহিকভাবে পুনর্ব্যবহারযোগ্য কাঁচামাল সংগ্রহ ও গুণমান নিয়ন্ত্রণে বাধা এসেছে।

২.৩ আগামীর পথরেখা

পণ্যে বৈচিত্র্য

রিসাইক্লিং-প্লাস্টিক থেকে বোর্ড, ফার্নিচার, হোমডেকোরেটর ইত্যাদি পণ্য যুক্ত করা হবে, যাতে ব্যক্তি, ব্যবসা ও সরকারি সংস্থার সকলের চাহিদা মেটানো যায়।

বিপণন ও চাহিদা-সৃষ্টি শক্তিশালীকরণ

- স্কুল-কমিউনিটি-অনলাইনে শিক্ষামূলক ক্যাম্পেইন।
- করপোরেট অংশীদারদের সঙ্গে যৌথ প্রচারণা।
- ডিসকাউন্ট/প্রমোশন-প্রারম্ভিক ক্রেতা আকর্ষণ।
- নোট: মোট উৎপাদন ও মোট বিক্রয় ১৯০০ (ইউনিট/পিস)-এ সীমিত ছিল; যা ব্যবসা চালাতে যথেষ্ট নয়।

অনলাইন উপস্থিতি ও ই-কমার্স উন্নয়ন

ওয়েবসাইটের ইউজার-এক্সপেরিয়েন্স, পণ্য-প্রদর্শন, পেমেন্ট ও শিপিং-অপশন বাড়ানো; পাশাপাশি বড় ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম-এর সঙ্গে পার্টনারশিপ খোঁজা।

কৌশলগত অংশীদারত্ব ও অর্থায়ন

অন্যান্য এনজিও/ব্যবসা/সরকারি সংস্থার সঙ্গে অংশীদারত্বে শক্তিশালী ওয়েস্ট-টু-রিসোর্স ভ্যালু-চেইন গড়ে তোলা; সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী/দাতার কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহ।

স্কেল-আপ ও উৎপাদন দক্ষতা

বর্জ্য-প্রসেসিং প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ, উৎপাদন-দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সাপ্লাই-চেইন অপটিমাইজেশন।

উপসংহার

Workaholic BD—পরিচালিত Waste to Resource প্রোগ্রামটি পরিবেশগত স্থায়িত্বের পাশাপাশি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরির ইতিবাচক সম্ভাবনা দেখিয়েছে। তবে চাহিদা সৃষ্টি ও স্কেল-আপ-এর জায়গায় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। পণ্যে বৈচিত্র্য, শক্তিশালী বিপণন, এবং কৌশলগত অংশীদারত্ব গড়ে তোলার মাধ্যমে এসব বাধা পেরিয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও প্রভাবশালী পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। সামনে অগ্রযাত্রায় উদ্ভাবন, দৃঢ় বাজার-উপস্থিতি, এবং কমিউনিটি-এনগেজমেন্ট-এ জোর দিয়ে বাংলাদেশে স্থায়িত্ব-সংস্কৃতি গড়ে তোলাই লক্ষ্য।



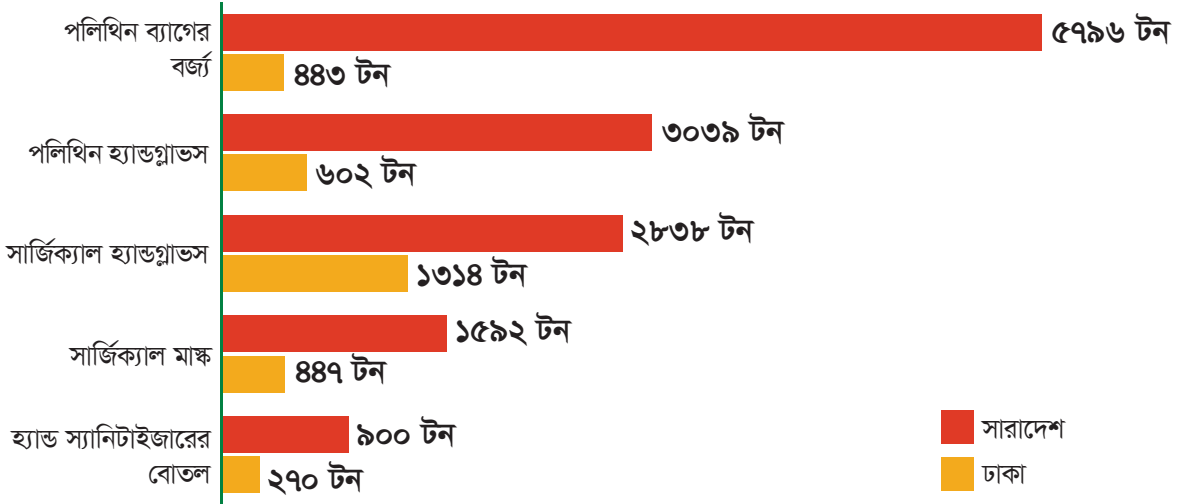
অধ্যায়-৩ বাংলাদেশে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

৩.১ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশ জনসংখ্যায় বিশ্বে অষ্টম। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রতিবেদন ২০১৯ সালের উপাত্ত অনুযায়ী এ জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৫৭ লাখ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৩%। এখানে শহরাঞ্চলে ২০১০-১৫ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৩%। ভাবনার বিষয় হলো, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে শহরাঞ্চলে মানবসৃষ্ট বর্জ্য তৈরি হচ্ছে এবং সেই সাথে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক থেকে ঢাকা বিশ্বের সবচেয়ে ঘন বসতিপূর্ণ মহানগরী। বিভিন্ন প্রয়োজনে মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে স্থানান্তরিত হওয়ার কারণে ঢাকা শহরের জনসংখ্যা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর তার সাথে বাড়ছে মানুষজনের তৈরি আবর্জনাও। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা মূলত একটি চ্যালেঞ্জিং বিষয় এবং ঢাকা শহরের ক্ষেত্রে তা আরো বেশি চ্যালেঞ্জিং কারণ এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, বাংলাদেশের মোট বর্জ্যের শতকরা ৩৭ ভাগ উৎপাদিত হয় রাজধানী ঢাকায়। তাই এ শহরের ক্ষেত্রে বর্জ্য সংগ্রহ করে তা আবর্জনার স্তুপে পাঠিয়ে দেয়ার পরিবর্তে প্রয়োজন পরিকল্পিত সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা।

এনভাইরোনমেন্ট অ্যান্ড সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (এসডোর) এর এক গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা যায়, করোনার কারণে সাধারণ ছুটি ঘোষণার একমাস পর উৎপাদিত হয়েছে প্রায় সাড়ে ১৪ হাজার টন প্লাস্টিক বর্জ্য। এর মধ্যে শুধু ঢাকায় প্রায় তিন হাজার ৭৬ টন যেখানে সার্জিক্যাল মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস এবং স্যানিটাইজারের বোতল এই বর্জ্যের নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। এছাড়া এখানে ত্রাণ বিতরণে ব্যবহৃত প্লাস্টিকের ব্যাগও ভূমিকা রেখেছে।



২৬ মার্চ থেকে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত উৎপাদিত বর্জ্য

প্রতিবেদনে বলা হয়, ২৬ মার্চ থেকে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত দেশে পলিথিন ব্যাগের বর্জ্য পাঁচ হাজার ৭৯৬ টন, পলিথিন হ্যান্ডগ্লাভস তিন হাজার ৩৯ টন, সার্জিক্যাল হ্যান্ডগ্লাভস দুই হাজার ৮৩৮ টন, সার্জিক্যাল মাস্ক এক হাজার ৫৯২ টন এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজারের বোতল থেকে ৯০০ টন প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপাদন করেছে। ঢাকায় সর্বোচ্চ এক হাজার ৩১৪ টন সার্জিক্যাল হ্যান্ড গ্লাভসের বর্জ্য পাওয়া গেছে। এছাড়া রাজধানীতে পলিথিন হ্যান্ডগ্লাভস ৬০২ টন, সার্জিক্যাল মাস্ক ৪৪৭ টন, পলিথিন ব্যাগ ৪৪৩ ও হ্যান্ড স্যানিটাইজারের বোতল থেকে ২৭০ টন বর্জ্য উৎপাদিত হয়েছে।

বাংলাদেশের পৌর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আইন কাঠামো গড়ে উঠেছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের উপর ভিত্তি করে। এছাড়াও জাতীয় সংসদে প্রণীত আইন, নিয়মাবলী, উপ-আইন ও বিভিন্ন বিধিমালা নিয়ে এ ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হয়ে থাকে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮ (১) ধারায় স্পষ্টভাবে বলা আছে যে, “জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন।” এছাড়াও ২০১১ সালের ৩০ জুন পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে ১৮ (ক) ধারা যোগ করা হয়। নতুন এই ধারায় বলা হয়েছে যে, “রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন।”

বাংলাদেশে পৌর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত যে সকল পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইন, বিধিমালা ও আদেশ রয়েছে সেগুলো হলো- (১) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫, (২) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (সংশোধিত), ২০০০, (৩) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (সংশোধিত), ২০০২, (৪) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (সংশোধিত), ২০১০, (৫) পরিবেশ আদালত আইন,



২০০০, (৬) পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭, (৭) পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা (সংশোধিত ফেব্রুয়ারি), ১৯৯৭, (৮) পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা (সংশোধিত আগস্ট), ১৯৯৭, (৯) পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ (সংশোধিত ২০০৫), (১০) পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ (সংশোধিত ২০১০)।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যেসকল বিধিমালা ও আদেশ রয়েছে সেগুলো হলো- (১) চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮, (২) বিপদজনক বর্জ্য ও জাহাজ ভাঙ্গার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১, (৩) ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য হইতে সৃষ্ট বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৭ (খসড়া)।

বর্তমানে বাংলাদেশে শহরাঞ্চলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ও জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা (জাইকা) এর যৌথ উদ্যোগে ঢাকার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ক্লিন ঢাকা মাস্টার প্ল্যান নামে মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সোশ্যাল বিজনেস এন্টারপ্রাইজ ওয়েস্ট কনসার্ন, বাসাবাড়ি পর্যায়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজ করছে। ইউনিসেফ সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোতে বর্জ্য পুনর্ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু করেছে।

‘বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫’ অনুযায়ী ‘কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা’র খসড়া তৈরি করেছে পরিবেশ অধিদপ্তর। জৈব ও অজৈব বর্জ্য আলাদা করা বিষয়ে খসড়া নীতিমালায় একটি বিধান রাখা হয়েছে। বিধানে বলা হয়েছে, যদি কেউ জৈব ও অজৈব বর্জ্য আলাদা করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাদেরকে সর্বোচ্চ ২,০০০ টাকা জরিমানা করা হবে এবং একই কাজ পুনরায় করলে সর্বোচ্চ ৪০০০ টাকা জরিমানা করা হবে। বর্জ্যকে রিসাইক্লিং এর মাধ্যমে সম্পদে পরিণত করতে নতুন নীতিমালা বিশেষভাবে সহায়তা করবে এবং দীর্ঘ মেয়াদে দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রাখবে। দেশে কার্যকর রিসাইক্লিং শিল্প গড়ে তুলতে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অধীনে ‘৩-আর প্রকল্প’ ও ‘৬৪ জেলায় কমপোস্টিং’ প্রকল্পসহ বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সরকার অনেক প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ প্রতি বছর জাতিসংঘ ঘোষিত ‘বিশ্ব বসতি দিবস’ যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন করে। ২০১৯ সালে বিশ্ব বসতি দিবসের প্রতিপাদ্য ছিলো Frontier Technologies as an Innovative Tool to Transform Waste to Wealth অর্থাৎ ‘বর্জ্যকে সম্পদে পরিণত করতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার’। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বর্তমানে এই প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত সমায়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় আলোচ্য প্রতিপাদ্যের বিষয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় হতে সকল নির্মিতব্য ভবনে সুয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ও আবর্জনা ব্যবস্থাপনার সংস্থান রেখে ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৮ কে হালনাগাদ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া সরকারি-বেসরকারি আবাসন প্রকল্পসমূহে ‘সুয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট’ এবং ‘সলিড ওয়েস্ট ডাম্পিং প্ল্যান্ট’ নির্মাণের বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করা হয়েছে। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্মিত ভবনগুলোতে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সুয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের সংস্থান করা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভাসহ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত সকল সরকারি-বেসরকারি দপ্তর, এনজিও’র সাথে সমন্বয় করে নগরের সৃষ্ট বর্জ্য রিসাইক্লিং করতে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

বর্জ্য নিয়ে প্রচলিত দুটো কথা হলো- আজকের বর্জ্য আগামীকালের সম্পদ এবং আবর্জনাই নগদ অর্থ। উন্নত দেশগুলোতে যেমন সুইডেন ও নরওয়েতে বর্জ্য প্রক্রিয়াজাত করে ব্যবহারযোগ্য লাভজনক ভিন্ন বস্তুতে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। এজন্য তারা অন্য দেশ থেকেও বর্জ্য আমদানিও করছে। বাংলাদেশেরও বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর মতো বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। বর্জ্যকে সম্পদে পরিণত করতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে বর্জ্য সংরক্ষণ, নিরপেক্ষায়ণ, নিক্রিয়করণ অথবা প্রক্রিয়াজাতকরণ করে ব্যবহার উপযোগী বিভিন্ন নতুন জিনিস বানানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। এতে পরিবেশের সাথে সাথে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে দেশ ও দেশের মানুষ।

বাংলাদেশ সরকার ঢাকাসহ দেশের সকল বিভাগীয় শহরে কমিউনিটিভিত্তিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করেছে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বাসাবাড়ি থেকে পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য পৃথকভাবে সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ বর্জ্য নিয়ে নবায়ন যোগ্য জ্বালানি ও কম্পোস্ট সার তৈরির লক্ষ্যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। সকলের সম্মিলিত প্রয়াস ও উদ্ভাবনী প্রযুক্তির সমন্বয়ে বর্জ্যকে সম্পদে পরিণত করতে হবে। আর এভাবেই স্বল্প সম্পদের মাধ্যমে অধিক মানুষের চাহিদা পূরণ করে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশেও নিশ্চয়ই এগিয়ে যাবে সে পথেই সফল সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে।

সর্বোপরি, আজকের শিশু দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। তাই ছোটবেলা থেকেই শিশুদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে এবং এ শিক্ষা দিতে হবে পরিবার থেকেই। পরিবার থেকে যেখানে সেখানে ময়লা না ফেলার শিক্ষা শিশুদের ছোটবেলা থেকেই সচেতন হতে সাহায্য করবে। তাছাড়া পাঠ্যপুস্তকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে নির্দিষ্ট অধ্যায় সংযুক্ত করলে এবং গণমাধ্যমে যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান প্রচারসহ কার্যকর বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে শিশুসহ আমাদের সকলকে সচেতন করে তুলতে হবে। আর এভাবেই নিরাপদ, সুস্থ-সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিত করে যেখানে সেখানে বর্জ্য ফেলার চর্চা বন্ধ হবে ব্যক্তি থেকে বৃহত্তর পর্যায়ে। (বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও বাংলাদেশ প্রসঙ্গ, গাজী শরীফা ইয়াছমিন, কালের কণ্ঠ, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২১)

৩.২ বাংলাদেশে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রতিবন্ধকতাসমূহ

ভূমিকা

বাংলাদেশ দ্রুত নগরায়িত হচ্ছে। শহর বড় হচ্ছে, জীবনযাত্রা বদলাচ্ছে, আর সেই সঙ্গে বাড়ছে বর্জ্যের পরিমাণ ও বৈচিত্র্য। প্রতিদিন দেশে আনুমানিক ২৫-৩০ হাজার টন কঠিন বর্জ্য তৈরি হয়; এর প্রায় সাত ভাগের পাঁচ ভাগ অর্থাৎ ৭০% শহরাঞ্চলেই। ঢাকায় দৈনিক উৎপাদন ৬-৭ হাজার টনের বেশি। এই বর্জ্যের বড় অংশই জৈব (খাদ্য-কিচেন-বাজারের), তারপর আছে রিসাইক্লেবল (প্লাস্টিক, কাগজ, ধাতু, কাঁচ), ঝুঁকিপূর্ণ (হাসপাতাল, ই-ওয়েস্ট), এবং নির্মাণ সামগ্রী ও বিধ্বংস বর্জ্য। উৎসে পৃথকীকরণ না হওয়ায় সব বর্জ্য একসঙ্গে মিশে যায়। আর তার বেশীরভাগ অংশ ফেলা হয় খোলা স্থান, নদী-নালা, ড্রেন ইত্যাদিতে। ফলে সেগুলো সংগ্রহ করে রিসাইক্লিং করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এত বিশাল পরিমাণ বর্জ্য রিসাইক্লিং বা নিরাপদে পরিবেশের ক্ষতি না করে নিষ্পত্তি করার মতো প্রযুক্তি ও অবকাঠামো আমাদের দেশে নেই। তাই বর্ষা এলে ডাস্টবিন-ড্রেন উপচে সৃষ্টি করে জলাবদ্ধতা; শুকনো মৌসুমে ধুলা, দুর্গন্ধ ও রোগজীবাণু ছড়ায় পরিবেশে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণে অনগ্রসরতার কারণে এই ভয়াবহতা দিনে দিনে বেড়েই চলছে।

শহরের বিভিন্ন আয়ের মানুষের কঠিন বর্জ্য উৎপাদনের হার

আয়ের স্তর	জনপ্রতি বর্জ্য উৎপন্ন (কেজি/দিন)						
	ডিসিসি	সিসিসি	কোসিসি	আরসিসি	বিসিসি	এসসিসি	গড়
উচ্চ বিত্ত	০.৫০৪	০.৩৭৮	০.৩৬৮	০.৩৪৩	০.৩২৭	০.৪২৯	০.৩৯২
উচ্চ মধ্যবিত্ত	০.৩৮৯	০.৩৪৩	০.৩৩৩	০.৩২০	০.২৭৮	০.৩৯৫	০.৩৪৩
মধ্যবিত্ত	০.৩৭১	০.৩৫০	০.৩১৯	০.২৪২	০.২৪৭	০.৩৪০	০.৩১২
নিম্ন মধ্যবিত্ত	০.৩০৫	০.২৫৩	০.২৬৪	০.৩০৯	০.২৬৯	০.২৪৮	০.২৭৫
নিম্ন বিত্ত	০.২৭০	০.১৮৯	০.২০৩	০.২৩৯	০.১৭২	০.২৬০	০.২২২
গড়	০.৩৬৮	০.০৩০	০.২৯৭	০.২৯১	০.২৫৯	০.৩৩৪	০.৩০৯

Source: Alamgir and Ahsan, 2007

বাংলাদেশের শহরের কঠিন বর্জ্য উৎপাদনের চিত্র

বছর	সর্বমোট শহুরে জনগন	শহুরে জনগন (% মোট জনসংখ্যা)	বর্জ্য উৎপাদনের হার (কেজি/প্রতিজন/প্রতিদিন)	সর্বমোট বর্জ্য উৎপাদন (টন/দিন)
১৯৯১	২০,৮৭২,২০৪	২০.১৫	০.৪৯**	৯,৮৭৩.৫
২০০১	২৮,৮০৮,৪৭৭	২৩.৩৯	০.৫***	১১,৬৯৫
২০০৪	৩২,৭৬৫,১৫২	২৫.০৮	০.৫***	১৬,৩৮২
২০২৫	৭৮,৪৪০,০০০	৪০.০	০.৬***	৪৭,০৬৪

Source: ** ADBI and ADB 2000; ***Zurbrugg 2002

বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশনের কঠিন বর্জ্যের উৎপাদনের হার বিভিন্ন ধরণের। জনপ্রতি সবচেয়ে বেশী বর্জ্য উৎপন্ন হয় ঢাকায়, ০.৪৮৫ কেজি/প্রতিদিন এবং সবচেয়ে কম বরিশালে ০.৩২৫ কেজি/প্রতিদিন, যা মূলত শহরগুলোতে বসবাসকারী জনসংখ্যা অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। রাজধানী ঢাকায় বসবাসকারী জনগনের অর্থনৈতিক অবস্থা অন্যান্য শহরের তুলনায় ভালো হওয়ায়, এখানে বসবাসকারীদের জনপ্রতি বর্জ্য উৎপাদনও অন্য সকল শহরের তুলনায় বেশী।



বাংলাদেশে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মূল প্রতিবন্ধকতাসমূহ হলোঃ

পৃথিবীর একমাত্র জীব মানুষ যাদের নির্দিষ্ট কোনো খাবার নেই-তারা প্রায় সবই খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং যাদের চাহিদার কোনো শেষ নেই। তাইতো তাদের এই সীমাহীন চাহিদা, বিলাসিতা ও বৈচিত্রপূর্ণ খাবারের চাহিদা পূরণ করতে তারা এমন কিছু বর্জ্য উৎপাদন করছে যা প্রকৃতিতে সহজে মিশে যেতে পারে না। কিন্তু অন্যান্য সকল প্রাণীর উৎপাদিত বর্জ্য প্রাকৃতিক নিয়মে নিষ্পত্তি হয়। আর মানুষের এই চাহিদা বৃদ্ধির পাশাপাশি বর্জ্য উৎপাদনের হার ক্রমাগতভাবে বাড়ছে বৈকি কমছে না। বিশ্বের অন্যান্য দেশ এ ব্যাপারে সচেতন হওয়ার কারণে এবং তাদের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা থাকার কারণে তারা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও বাংলাদেশে এটা ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। কারণ, এখানে বিবিধ প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এর ভিতর গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

মানুষের অসচেতনতা ও অজ্ঞতা

আমাদের শত শত বছরের সঙ্কৃতি যেখানে-সেখানে বর্জ্য ফেলা। আমরা বহুদিন ধরে শিখে এসেছি, “বাড়ির ভেতরটা পরিষ্কার থাকলেই হলো; দরজার বাইরেরটা কারো না কারো দায়িত্ব।” তাই খাওয়া শেষ করে প্লাস্টিকের প্যাকেটটা হেলাফেলায় ছুড়ে ফেলা, বাজারের থলে বা খাবারের উচ্ছিষ্টটা ড্রেনে গুঁজে দেওয়া-এসব আমাদের কাছে প্রায় স্বাভাবিক ব্যাপার। এর কুফলটা আমরা দেখেও দেখি না-বা দেখতে চাইও না। যে বর্জ্যটা একটু দূরে সরিয়ে রেখে মনে করি “আপদ কাটল”, সেটাই ঘুরে ফিরে আমাদের দরজায় রোগ, দুর্গন্ধ আর জলাবদ্ধতা হয়ে ফিরে আসে-এ কথা বুঝতে বুঝতেই অনেক সময় দেরি হয়ে যায়।

রাতে চুপচাপ ব্যাগভর্তি রান্নাঘরের বর্জ্য নিয়ে কেউ রাস্তার কোণে রেখে আসে; ভোরের বৃষ্টিতে সেই ব্যাগ ফেটে ড্রেনে নেমে যায়। ড্রেনটা একটু একটু করে ভরাট হয়, পানি আর নামে না; বর্ষায় সেই জীবাণুযুক্ত পানি উঠে আসে রাস্তায়। মশা বাড়ে, মাছি বাড়ে, ডেঙ্গু-ডায়রিয়া-টাইফয়েডের খবর বাড়ে। আমরা ভেবেছিলাম, “বাড়ির ভেতর তো পরিষ্কার।” অথচ সেই একই বর্জ্যের কণা বাতাসে ভেসে, পায়ের ধুলোয় লেগে, জলকাদায় মিশে আবার আমাদেরই ঘরে ঢুকে পড়ে। শহরের রাস্তা, ড্রেন, কালভার্ট বারবার ভেঙে মেরামত করতে হয়; টাকার অপচয় হয়, অথচ রোগ, দুর্গন্ধ, জলাবদ্ধতার দুষ্টচক্র থামে না।

পয়ঃবর্জ্যের গল্পটাও তেমনই। পরিচ্ছন্নতাকর্মী ডেকে সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করালাম, মনে হলো দায়িত্ব শেষ। ভাবি না যদি সেই পয়ঃবর্জ্য ড্রেনে ঢালা হয়, বা কোনো খালি জায়গায় ফেলে দেওয়া হয়-তাহলে ক্ষতি কার? ড্রেনের পানি তখন আর “পানি” থাকে না; সেটা হয়ে ওঠে রোগজীবাণুর আঁতুড় ঘর। আরও ভয়ঙ্কর-কোথাও কোথাও সেপটিক ট্যাংকের লাইন সরাসরি ড্রেনের সঙ্গে, এমনকি গোপনে ভূগর্ভস্থ পানির স্তরের সাথেও সংযুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে। এটা করে আজ হয়তো ঝামেলা এড়িয়ে গেলাম; কালকে যখন নলকূপের পানি দূষিত হবে, সুপেয় পানি দুস্থাপ্য হয়ে যাবে-তখন আমাদের কে বাঁচাবে? ভাবলে শিউরে উঠতে হয়-আমাদেরও কি একদিন মধ্যপ্রাচ্যের শহরগুলোর মতো বোতল-বন্দি পানির ওপর নির্ভর করে বাঁচতে হবে?

সবশেষে, আসল কথাটা হলো-আমরা বর্জ্যকে “আপদ” বানাই অসচেতনতা ও এ বিষয়ে যথাযথ জ্ঞানের অভাবে। আসলে বর্জ্য আপদ নয়; অব্যবস্থাপিত বর্জ্যই আপদ। রান্নাঘরের বর্জ্য যদি আলাদা রাখা যায়, তাহলে সেটাই উচ্চমানের কম্পোস্ট/বায়োগ্যাস বা ফার্টলাইজার হয়; যা মাটির প্রাণ বা কন্ডিশনার বলে খ্যাত। কাগজ-কাঁচ-ধাতু-প্লাস্টিক আলাদা করে রেখে রিসাইক্লিংয়ের ভ্যালুচেইনে (ভাস্করীওয়ালাদের কাছে) বিক্রি করলে টাকাও আসে, আবার পরিবেশও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। অর্থাৎ, যে ব্যাগটা গত রাতে ড্রেনের মুখ বন্ধ করেছিল, সেটাই কালকে সঠিক হাতে পড়লে সম্পদ হতে পারত। যেখানে সেখানে ছুঁড়ে না ফেলে এই একটুখানি “উৎসে আলাদা করা”-এই একটুখানি “নির্ধারিত বর্জ্য

সংগ্রহকারীর হাতে দেওয়া”- এই একটুখানি “নির্দিষ্ট স্থানে রাখা”-এইটুকু শৃঙ্খলাই শহরের পরিবেশ যেমন পরিচ্ছন্ন রাখে-তেমনি আমরাও অনেক ধরনের রোগের উপদ্রব থেকে রক্ষা পেতে পারি।

হ্যাঁ, পথটা আচরণ বদলের-কিন্তু অসম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে, বর্জ্য শত্রু নয়; ভুল জায়গায় পড়লেই সে শত্রু হয়ে ওঠে। ঠিক জায়গায় পৌঁছাতে পারলে, সে আমাদের শহরেরই সম্পদ-কখনো জ্বালানি, কখনো সার, কখনো আবার নতুন কাঁচামাল। সিদ্ধান্তটা আমাদের-আমরা বর্জ্যকে “বিপদ” বানিয়ে রাখব, নাকি “সম্পদ” বানাবো। আজ যে চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি, সেখান থেকে এগোনোর দিশা আমাদেরই ঠিক করতে হবে। কারণ, আমাদের অসচেতনতা ও অবহেলার কারণে আমরাই অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্তের স্বীকার হচ্ছি। আর লাভবান হচ্ছে চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ। আমাদের কষ্টের টাকা চলে যাচ্ছে হাসপাতালের মালিকদের কাছে। আর তাইতো দিনে দিনে হাসপাতালের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। তাই নিজে এ ব্যাপারে সচেতন হোন ও অন্যকেও সচেতন করে তুলুন। আর তাহলেই ভালো থাকবে শহরের পরিবেশ-ভালো থাকবে আমরা।



যথাযথ প্রযুক্তি ও অবকাঠামোর অভাব

উৎপাদিত সকল ধরনের বর্জ্যকে পরিবেশের ক্ষতি না করে নিরাপদে নিষ্পত্তি করতে গেলে যে প্রযুক্তির প্রয়োজন হয়; তার ব্যয়ভার বহন করার মতো সক্ষমতা আমাদের নেই। গৃহস্থালী বর্জ্য রিসাইক্লিং এর সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হলো-আলাদাকরণ। কারণ, এই বর্জ্যের ভিতর অনেক ধরনের অজৈব পদার্থ মেশানো থাকে যাদেরকে ম্যানুয়ালী বেঁছে আলাদা করতে গেলে যে পরিমান লোকবল ও স্থান প্রয়োজন তা আমাদের নেই। আবার যান্ত্রিক পদ্ধতিতে যথাযথভাবে (১০০%) আলাদা করা যায় না এবং সেটা ব্যয়বহুল। আর আলাদাকৃত জৈব বর্জ্যের ভিতর ছোট-খাট প্লাস্টিকের প্যাকেট থেকে গেলে উৎপাদিত জৈব সারের ভিতর মাইক্রোপ্লাস্টিক দ্রবীভূত হয়ে যাবে। কারণ, বর্জ্য পচন প্রক্রিয়ায় প্রায় ৬০-৭০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা উৎপন্ন হয়।

আবার, গৃহস্থালী বর্জ্যের ভিতর যেসব অজৈব বর্জ্য (প্লাস্টিক, পাতলা পলিথিন, কাগজ, বিবিধ রকমের প্যাকেট, কাঠ, ইত্যাদি) থাকে তা সাধারণতঃ রিসাইকেলযোগ্য নয়। তাই এদেরকে ল্যান্ডফিলে ডাম্পিং করলে দ্রুত সে স্থান পূর্ণ হয়ে যায়। তখন বর্জ্য ডাম্পিং করার স্থান সংকুলান হয় না; তাই তাদেরকে পুড়িয়ে ফেলতে হয়-যা থেকে নির্গত গ্যাস মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। একইরকমভাবে মেডিক্যাল বর্জ্যকেও পুড়িয়ে ফেলা নিরপদ; কিন্তু এসকল বর্জ্যকে পুড়িয়ে মেশিনের মাধ্যমে সংশোধন করে প্রকৃতিতে ছাড়ার প্রযুক্তি আমাদের নেই। কারন, এগুলো ব্যয়বহুল। এর সমাধান হিসেবে বলা যায়-“সোর্স সেগ্রিগেশন”। অর্থাৎ বর্জ্য উৎপাদনকারী যদি বিবিধ শ্রেণির বর্জ্য আলাদা আলাদা পাত্রে রাখে এবং আলাদাভাবে সংগ্রহ করা হয় তাহলে এগুলোকে রিসাইকেল করা অনেকখানি সহজ হবে।



স্থানীয় সরকারের অবহেলা

স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা, জেলা প্রশাসন, পরিবেশ অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য বিভাগ ইত্যাদি) ইচ্ছা করলেই সম্মিলিতভাবে তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করে, সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে, অবৈধভাবে বর্জ্য ফেলার স্থান উচ্ছেদ করার পর নিষেধাজ্ঞা জারি করে

যেখানে সেখানে বর্জ্য ফেলার অভ্যাস বন্ধ করতে পারেন; কিন্তু এক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেবার অগ্রহ তাদের কম। কাজটা প্রধানতঃ পৌরসভার হলেও সকল সরকারী প্রতিষ্ঠান সম্মিলিতভাবে একটা পরিকল্পনা ও কৌশল নির্ধারণ করে কাজ করলে এ ব্যাপারে দ্রুত ও কার্যকরী ফলাফল পাওয়া যাবে বলে আশা করি। তবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সর্বস্তরের জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করলে কাজটি টেকসই হবে। তা না হলে আবার পূর্বের অভ্যাসে মানুষ ফিরে যেতে পারে-কার্যকরী নাও হতে পারে।

৩.৩ বাংলাদেশে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অংশীদারগণের দায়িত্ব



ভূমিকা

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা “একটি সংস্থার কাজ” নয়। এখানে নীতিনির্ধারক থেকে নাগরিক-সবাই অংশীদার। দায়িত্ব স্পষ্ট না থাকলে দায়ও কারও থাকে না। উদাহরণ- আমরা জানি, আমাদের দেশে একসময় খোলা জায়গায় মল-মূত্র ত্যাগ করার পরিমাণ অত্যধিক ছিলো। কেন্দ্রীয় সরকার, স্থানীয় সরকার, এনজিও ও সাধারণ জনগণ সম্মিলিতভাবে দীর্ঘদিন যাবৎ বিবিধ প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে সচেতন করে তোলায় আজ সেটা প্রায় শূণ্যের কোঠায় নেমে এসেছে। আজ এ দেশের মানুষ তার বাড়িতে একটা স্যানিটারী ল্যাটিন থাকলে গর্ববোধ করে। তাই সেরকমভাবে সবাই একসাথে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সমস্যার সমাধানে পরিকল্পনা মারফিক নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে গনজাগরণ সৃষ্টি করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে। নিচে সকল অংশীদারীগণের দায়িত্ব সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হলোঃ

কেন্দ্রীয়/স্থানীয় সরকার/নিয়ন্ত্রক

- নীতি ও বিধি: 5R (Refuse- Reduce- Reuse-Repurpose-Recycle), Waste Management Rules, EPR (Extended Producer Responsibility), পাতলা পলিথিন যথেষ্ট ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি ইত্যাদি।
- মানদণ্ড ও তদারকি: পরিবেশ ছাড়পত্র, বায়ু-পানি-মাটি মানরক্ষা; বেআইনি ডাম্পিং-এ শাস্তি।
- অর্থায়ন-প্রণোদনা: ফলাফলভিত্তিক অনুদান (RBF), স্বল্পসুদে অবকাঠামো FY, PPP সুবিধা, ভ্যাট/গুঞ্জে আর্থিক প্রণোদনা (যেখানে প্রযোজ্য)।

সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/ডিপিএইচই (LGI)

- শহর-ভিত্তিক পরিকল্পনা: উৎসে পৃথকীকরণ, রুট-অস্টিমাইজেশন, ট্রান্সফার স্টেশন, কম্পোস্ট/বায়োগ্যাস, স্যানিটারি ল্যান্ডফিল-সব এক নকশায়।
- ফি-নীতি ও বিলিং: আয়-গ্রুপভিত্তিক শাস্ত্রীয় ট্যারিফ; হটলাইন, ডিজিটাল বিলিং-কালেকশন।
- জায়গা প্রদানঃ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অবকাঠামো/স্থাপনা তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা প্রদান।
- বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি শেয়ারিং: বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদী কর্ম পরিকল্পনাকে বছরে বা মাসে ভেঙ্গে তা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা। অপারেটর থাকলে কাজ ভাগাভাগি করে প্রতি মাসে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রদান নিশ্চিত করা।
- কৌশলগত সহায়তা প্রদান ও সমন্বয় সাধনঃ
 - ❖ এনজিও/গ্রাইভেট সেক্টরের সাথে KPI ভিত্তিক চুক্তি-কভারেজ ও রিসাইক্লিং এর হার
 - ❖ তাদেরকে আন্তরিকভাবে সার্বিক সহযোগিতা করা।
 - ❖ প্রয়োজনে তাদের সাথে আদায়কৃত করের অর্থ ভাগাগাগি করে অথবা প্রযুক্তি/অবকাঠামোগত উন্নয়ন করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার একটা কার্যকরী পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করা।
- গন-যোগাযোগঃ ওয়ার্ড ভিত্তিক উঠান বৈঠক/কর্মশালা/ক্যাম্পেইন, স্কুল প্রোগ্রাম, সোর্স সেগ্রিগেশন ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ। প্রয়োজনে মাঝে মাঝে ঝটিকা অভিযান চালানো। প্রয়োজনে আইন প্রয়োগ করা।
- মনিটরিং এবং ফলো-আপঃ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কর্মকাণ্ডকে কড়া নজরদারী ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

পরিবেশ অধিদপ্তর

কার্যক্রমকে নজরদারীর আওতায় এনে জরিমানা প্রদান ও যথাযথভাবে করলে সার্টিফিকেট প্রদান।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাই তাদেরকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সচেতন করে তুললে দেরীতে হলেও একদিন পরিবর্তন আসবেই।

তাই স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীদের সচেতন করে তোলার পাশাপাশি গনসচেতনতা আনতে তারা মাঝে মাঝে বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম করতে পারে।

প্রাইভেট সেক্টর

৩৭

- পৌরসভার সহযোগী সংস্থা হিসেবে বর্জ্য সংগ্রহ ও রিসাইক্লিং করার ব্যবস্থা গ্রহণ ও সেগুলোর চাহিদা সৃষ্টি পূর্বক ব্যবসা করা।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাঠামো তৈরীতে পৌরসভার সাথে অনুদান/ফান্ড শেয়ার করা।

এনজিও/সিবিও/সামাজিক ব্যবসা

- সচেতনতা, প্রাইমারি কালেকশন, উৎসে পৃথকীকরণে সহায়তা, অনানুষ্ঠানিক কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন, PPE, স্বাস্থ্য সুরক্ষা-এখানে তারা পৌরসভার সহযোগী সংস্থা হিসেবে কাজ করতে পারে।
- যুবদের প্রশিক্ষণ ও আর্থিক অনুদানসহ প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি প্রদান করে নিয়মিত তদারকি করে বর্জ্য রিসাইক্লিং এর উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা।
- দরিদ্র ও অসচেতন জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে সংগঠন (সিবিও) তৈরী করা।
- বর্জ্য সংগ্রহ, সার্ভিস চার্জ সংগ্রহ ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- মনিটরিং, ফলো-আপ, বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা প্রনয়ন ও অগ্রগতি শেয়ারিং।

স্বাস্থ্যখাত/হাসপাতাল

লাল-হলুদ-নীল-কালো রঙভিত্তিক বিনে বর্জ্য পৃথকীকরণ, ধারালো ও সংক্রামক বর্জ্যের আলাদা সংগ্রহ-নিষ্পত্তি, লাইসেন্সধারী অপারেটরের সাথে চুক্তি।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী

- কমপক্ষে অজৈব বর্জ্যগুলো কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে নতুন পরিবেশবান্ধব পণ্য তৈরী।
- বর্জ্য রিসাইক্লিং এ নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার।

শিল্প ও নির্মাণ খাত

Hazardous বর্জ্য অনুমোদিত ট্রিটমেন্ট-এ; নির্মাণ বর্জ্য থেকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য অ্যাগ্রিগেট তৈরি, RECP নিশ্চিতকরণ, সাইট-ম্যানেজমেন্ট শক্ত করা।

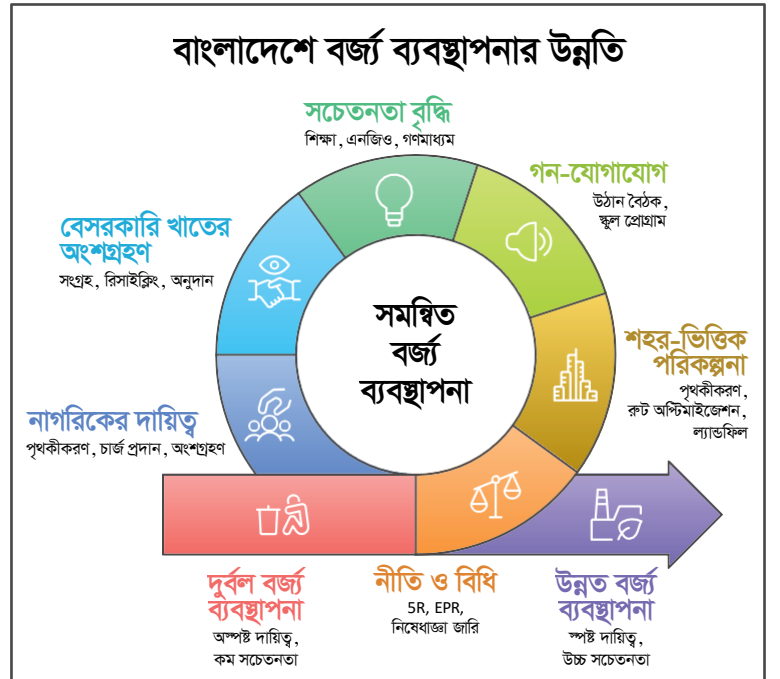
নাগরিক/বর্জ্য উৎপাদক

- সোর্স সেগ্রিগেশনে অভ্যস্ত হওয়া, নিয়মিত বর্জ্য ও সার্ভিস চার্জ প্রদান
- স্থানীয় পরিচ্ছন্নতা কমিটি বা সচেতনতামূলক প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ।
- যেখানে-সেখানে বর্জ্য না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা।
- প্লাস্টিকজাত বর্জ্যের ব্যবহার কমানো ও রিসাইকেলিং প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা।

গনমাধ্যম

- বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় জনগনকে সচেতন করতে নিয়মিত প্রচার-প্রচারণা করা।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সফলতা ও উত্তম অভ্যাসগুলো নিয়মিতভাবে প্রচার করা।

পরিশেষে বলা যায়, দায়িত্ব মানে কেবল “তালিকা” নয়; এটি জবাবদিহি ও সহযোগিতার চুক্তি। যখন প্রতিটি পক্ষ আন্তরিকভাবে নিজের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে-তখনই সম্ভব একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সবুজ বাংলাদেশ গড়ার।





৩.৪ বাংলাদেশে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় PPP (পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ) মডেলের কার্যকারিতা

ভূমিকা

পৌরসভার হাতে সীমিত বাজেট-কিন্তু কাজ বিশাল: প্রতিদিন সংগ্রহ, পরিবহন, প্রক্রিয়াকরণ, ল্যান্ডফিল ম্যানেজমেন্ট। এই বাহুস্বতায় PPP এমন কাঠামো, যেখানে পৌরসভার নীতি-নেতৃত্ব ও জমি/অনুমোদন মিলিত হয় বেসরকারি/এনজিওর বিনিয়োগ, অপারেশনাল দক্ষতা ও উদ্ভাবন-এর সাথে; লক্ষ্য-ধারাবাহিক সেবা ও দীর্ঘমেয়াদে কস্ট-রিকভারি।

কেন PPP কার্যকর

- **অর্থায়ন-বিনিয়োগ ভাগাভাগি:** পৌরসভা একা যে কাজ পারে না, বেসরকারির মূলধন ও প্রযুক্তি যুক্ত হলে সেটি সম্ভবপর হয়-প্রকল্প শুরু ও স্কেল-আপ দ্রুত হয়।
- **কর্মদক্ষতা বাড়ে:** KPI ভিত্তিক চুক্তিতে কাজের অগ্রগতি পরিমাপযোগ্য হয়; ফলে কাজের লক্ষ্য অর্জন সহজ হয়।
- **ঝুঁকি ভাগাভাগি:** ডিমান্ড/ফিউচস্টক, অপারেশন, ফাইন্যান্স, রেগুলেটরি-কোন ঝুঁকি কার-এটি আগেই “রিস্ক-শেয়ার ম্যাট্রিক্স” স্থির থাকে; ফলে অপ্রত্যাশিত ক্ষতি একপক্ষের ঘাড়ে পড়ে না।
- **ফলাফলকেন্দ্রিক সেবা:** কভারেজ %, সোর্স-সেগ্রিগেশন %, ল্যান্ডফিল-ডাইভার্সন পূরণ না হলে চুক্তি বাতিল/জরিমানা হয়-এতে সেবা আউটকাম-ড্রিভেন থাকে, কাগজে নয়।

PPP সফল করতে যে “শর্ত” জরুরি

- **সাপ্রস্তু ট্যারিফ ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা:** ধাপে ধাপে বর্জ্য সংগ্রহের সেবা ফি সময় ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ছাড় প্রদান করতে হবে।
- **জবাবদিহিতা:** প্রাইভেট সেক্টর/এনজিও প্রতি মাসে তার কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন পেশ করার পাশাপাশি পৌরসভাকে অবগত করেই যেকোনো নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
- **পৌরসভার অংশীদারী আচরণ:** পৌরসভা চুক্তিতে KPI সেট করে দিয়ে সেটার যথাযথ অর্জন আশা করলে সমস্যার সমাধান হবে না। প্রাইভেট সেক্টর/এনজিও কে আন্তরিকভাবে সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে হবে। তাদেরকে আইনগত সুরক্ষা, ঘোষণা প্রদান, ঝুঁকি নিরসন, বাজেট ভাগাভাগি, কাজ ভাগাভাগি, প্রযুক্তিগত সহযোগিতা ইত্যাদি প্রদান করলে খুব কম সময়ে কাজের ফলাফল প্রদর্শিত হবে।
- **লভ্যাংশ বিনিয়োগ:** সকল অংশীদারীগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমটি লাভে পৌঁছালে কার্য পরিচালনা সংস্থা (প্রাইভেট সেক্টর/এনজিও)-র লভ্যাংশের কিছু অংশ কার্যক্রমের পদ্ধতিগত উন্নয়নে বিনিয়োগ করতে হবে।

PPP কোনো জাদু নয়; যথাযথ ডিজাইন + কঠোর মনিটরিং + ন্যায্য ঝুঁকি-বণ্টন থাকলে এটি কার্যকর, পরিমাপযোগ্য ও টেকসই সমাধান দেয়। পৌরসভার জন-স্বার্থ, বেসরকারির কর্মদক্ষতা এবং নাগরিকের অংশগ্রহণ-এই তিন স্তম্ভই সফল PPP-র মেরুদণ্ড। ফরিদপুরের অভিজ্ঞতা দেখায়-দাতা-নির্ভরতা নয়, নিয়মতান্ত্রিক কস্ট-রিকভারি দিয়েই শহর পরিষ্কার রাখা সম্ভব।



৩.৫ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কতিপয় সম্ভাব্য কৌশল

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

ভূমিকা

বেশীরভাগ মানুষ মনে করে, বর্জ্য সৃষ্টির কাজ তাদের এবং ব্যবস্থাপনার সকল দায়িত্ব পৌরসভার। কারণ তারা পৌরসভাকে কর দেয়। কিন্তু বাস্তবতা হলো- পৌরসভার জনবল এতটা বেশি নয় যে তারা প্রতিটা বাড়িতে আলাদাভাবে বর্জ্য সংগ্রহের সেবা দিতে পারবে এবং তাদের প্রদত্ত কর দ্বারা সমস্ত বর্জ্যকে নিরাপদে নিষ্পত্তি করতে পারবে। তাই সাধারণ জনগণকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা ও অব্যবস্থাপনার ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে সচেতন করে গড়ে তোলা ও তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছাড়া যথাযথভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব নয়।

লক্ষ্যঃ

একটি টেকসই সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শহর গড়া।

উদ্দেশ্যঃ

- পৌরবাসীদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতন করার মাধ্যমে শতভাগ পরিবার ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার আওতায় আনা।
- সংগৃহীত সকল বর্জ্যকে পুনর্ব্যবহার উপযোগী করা।
- স্টেকহোল্ডারদের দায়িত্ব ও কর্তব্য স্পষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার একটি টেকসই স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা করে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা।

নিম্নে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কিছু সম্ভাব্য কৌশল সংক্ষেপে তুলে ধরা হলোঃ

পৌরবাসীকে অন্তর্ভুক্তিকরনঃ

পৌরবাসী মন থেকে গ্রহণ না করলে আমরা যে পদক্ষেপ গ্রহণ করি না কেনো তা কোনোদিন টেকসই হবে না। তাই শহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার সিদ্ধান্ত তাদের উপর চাপিয়ে না দিয়ে বিভিন্নভাবে তাদেরকে এই মিশনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যেমন- প্রতিটা ওয়ার্ডে অথবা মহল্লায় ছাত্র-ছাত্রী, গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে পৌরসভা ও প্রেসক্লাবের তত্ত্বাবধানে একটি স্বেচ্ছাসেবী কমিটি গঠন করা যেতে পারে। যাদের দায়িত্ব হবে ঐ এলাকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা। কমিটির নাম হতে পারে “নগর উন্নয়ন কমিটি”। আর এই নামে একটি ফেসবুক পেজ খোলা যেতে পারে। যেখানে কমিটির সদস্যরা এবং সাধারণ জনগণ কোথায় ময়লা পড়ে আছে তা জানাবে, যেখানে সেখানে কাউকে ময়লা ফেলতে দেখলে প্রতিবাদ করবে, ছোট ছোট প্রোগ্রাম করে মানুষকে সচেতন করে গড়ে তুলবে, আমাদের সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করবে ইত্যাদি।

পত্রিকাগুলো এ ব্যাপারে নিয়মিত খবর প্রচার করবে। তার মানে, প্রত্যেকটি স্থানীয় পত্রিকায় প্রতিদিন নগর উন্নয়ন কমিটির একটা নিউজ থাকবে। এই কার্যক্রম কতটুকু এগোলো তা জানার জন্য প্রতিদিনই মানুষ ওই কলামটির জন্য অপেক্ষা করবে। এভাবে আস্তে আস্তে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

অবৈধ ডাম্পিং/ ডাস্টবিন উচ্ছেদ

অবৈধভাবে যেখানে সেখানে বর্জ্য ফেলার সুযোগ না থাকলেই এই প্রবণতা আন্তে আন্তে দূরীভূত হবে। আর তাই অবৈধভাবে যেসব স্থানে বর্জ্য ফেলা হচ্ছে তা পৌরসভার জনবল ও ট্রাক নিয়ে গিয়ে পরিস্কার করে নিষেধাজ্ঞা সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে। সেখানে ফুলের গাছ অথবা সবজির চারা লাগিয়ে দিয়ে হ্যান্ডমাইকে জনগণকে সেখানে বর্জ্য না ফেলে বর্জ্য সংগ্রহকারী ভ্যানে নিয়মিত বর্জ্য প্রদান করে সার্ভিস চার্জ পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ করতে হবে। পরবর্তী কিছুদিন দায়িত্ববান কাউকে ঐ স্থান নজরদারিতে রাখার জন্য অনুরোধ করতে হবে।

কেউ সেখানে বর্জ্য ফেললে তারা ছবি তুলে ওই ফেসবুক পেইজে আপলোড করে দিয়ে বলবে- “দেখুন, টাকা দেবার ভয়ে উনি যেখানে সেখানে বর্জ্য ফেলছে”। এভাবে জনগণ লজ্জায় পড়ে আর যেখানে সেখানে বর্জ্য ফেলবে না।

সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইনঃ পৌরবাসীকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর সচেতন করে গড়ে তোলার জন্য বিবিধ সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম চালু

রাখতে হবে; যা নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

- **মাইকিং ও লিফলেট প্রদানঃ** প্রথম কয়েকটি মাস একটু ঘন ঘন মাইকিং করা ও লিফলেট প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে।
- **ছোট ছোট প্রোগ্রাম (ওয়ার্ড, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদি)ঃ** প্রতিটা ওয়ার্ডের গণ্যমান্য ব্যক্তি, পৌরসভার প্রতিনিধি ও প্রেসক্লাবের নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে উঠান বৈঠক এবং প্রতিটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের উপস্থিতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের সহিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম করা যেতে পারে। তাছাড়া প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্জ্য রাখার বিন স্থাপন করা যেতে পারে। যার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের একটি নির্দিষ্ট স্থানে বর্জ্য রাখার অভ্যাস গড়ে উঠবে; পরবর্তীতে তারা এটা বাড়িতে অভ্যাস করবে এবং বাবা-মাকেও এই অভ্যাসে নিয়ে আসবে।
- **একটি বড় প্রোগ্রাম/র্যালীঃ** শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, পৌরসভার, ডিসি অফিসের ও প্রেসক্লাবের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ ও ছাত্র-ছাত্রীদের সমন্বয়ে শহরে একটি বড় প্রোগ্রাম বা র্যালীর আয়োজন করা যেতে পারে। সারা শহর ঘুরে এসে ডিসি অফিসের সামনে/পৌরসভার সামনে/শহরের মাঝখানে নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ জনগণকে যেখানে সেখানে না ফেলার ও বর্জ্য সংগ্রহকারী ভ্যানে বর্জ্য প্রদান করার পাশাপাশি নিয়মিত বিল পরিশোধ করার আহবান জানাবেন। এই কার্যক্রমটি শহরের মানুষদেরকে একটি পরিবর্তনের আভাস দিবে।
- **বিলবোর্ড স্থাপনঃ** পৌরসভার সামনে, মোড়ে মোড়ে বড় বিলবোর্ড স্থাপন করা যেতে পারে; যেখানে জনগণকে একটি পরিচ্ছন্ন শহর গড়ার আহবান জানানো হবে।
- **শহরের রাস্তাঘাট পরিষ্কারকারী একটি ভ্যান চালু করাঃ** জনগণকে যদি চাক্ষুষভাবে শহরের পরিবর্তন দেখানো না যায় তবে জনগণ এই কার্যক্রমে সায দিবে না; তাই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভ্যান চালু করা দরকার যেটি সারাদিন রাস্তার দু'পাশের বর্জ্য সংগ্রহ করবে এবং জনগণকে যেখানে সেখানে বর্জ্য না ফেলার জন্য অনুরোধ করবে।
- **শহরের রাস্তায় বিন স্থাপনঃ** শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্থায়ী বিন স্থাপন করা যেতে পারে এবং সেখান থেকে বর্জ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এ কাজটিও জনগণের মনে একটা পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করবে।
- **ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে প্রচারঃ** বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর সচেতনতা বৃদ্ধি করতে মসজিদের ইমাম ও অন্যান্য ধর্মগুরুদের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।
- **সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারঃ** একটি ফেসবুক পেজ ওপেন করে সেখানে নিয়মিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর সচেতনতামূলক বক্তব্য, ডকুমেন্টারি, কার্টুন ইত্যাদি প্রচার করা যেতে পারে।



অস্থায়ী বর্জ্য সংগ্রহের ড্রাম/ডাস্টবিন

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অন্যতম বড় খরচ হচ্ছে বর্জ্য সংগ্রহকারী ভ্যান তৈরী ও মেরামত এবং বড় সমস্যা হচ্ছে এই কাজের জন্য প্রয়োজনীয়

জনবল সহজে না পাওয়া। এই সমস্যার সমাধানে একটি মহল্লার কিছুদূর অন্তর অন্তর একটি অস্থায়ী বর্জ্য সংগ্রহের ড্রাম/ডাস্টবিন স্থাপন করা যেতে পারে; যাতে বর্জ্য সংগ্রহকারী ভ্যান/ঠেলাগাড়ি/ট্রলিকে সময় ও ভ্যান নষ্ট করে দূরবর্তী সেকেন্ডারি ডাম্পিং স্টেশনে যেতে না হয়।

পরিকল্পনাটা হল- সকালবেলাতেই ট্রাকে করে খালি ঢাকনাযুক্ত ড্রাম/ডাস্টবিনগুলো বর্জ্য সংগ্রহকারী এলাকার রাস্তার পাশে কিছুদূর দূর পরপর রেখে দিবে। ড্রাম/ডাস্টবিনগুলো আটকানো/তালাবদ্ধ করার ব্যবস্থা থাকবে; যাতে সাধারণ জনগণ উক্ত ড্রাম/ডাস্টবিনগুলোতে বর্জ্য ফেলতে না পারে। এর চাবি ট্রাক ড্রাইভার ও বর্জ্য সংগ্রহকারী ভ্যান/ঠেলাগাড়ি/ট্রলি চালকের নিকট থাকবে। একটি বা দুটি ট্রাক নিয়োজিত থাকবে কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর ড্রাম/ডাস্টবিনগুলো থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করে সরাসরি প্লান্টে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এর ফলে একজন বর্জ্য সংগ্রহকারী অনেক কম সময়ে অধিক বাড়ি/প্রতিষ্ঠান থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করতে পারবে। কমবে ভ্যান মেরামতের খরচ। পাশাপাশি বাড়বে গ্রাহক সন্তুষ্টি ও গ্রাহক সংখ্যা।

মডেল ওয়ার্ড

একটি ওয়ার্ড নির্বাচন করা হবে যাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে একটি মডেল ওয়ার্ডে পরিণত করা হবে। তার জন্য উক্ত ওয়ার্ডের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ, ওয়ার্ড প্রতিনিধি, সাধারণ জনগনের উপস্থিতিতে পৌরসভার প্রতিনিধিত্বে বারবার সভা করে একটি সামগ্রিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে। প্রয়োজনে স্থানীয় মহিলা পরিচ্ছন্ন কর্মীদের মাধ্যমে বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে। তারা ট্রলী করে বর্জ্য সংগ্রহ করে পাশ্ববর্তী ড্রাম/বিনে রাখবে। তারা কমিশনভিত্তিতে (বাসা প্রতি সার্ভিস চার্জ) কাজ করতে পারে। অথবা পৌরসভার মহিলা পরিচ্ছন্নতাকর্মী (যারা রাস্তা পরিষ্কার করেন) এই কাজ করতে পারেন। এর ফলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কমবে কর্মী সংকট ও খরচ।

যাইহোক, এটা হবে এমন একটি ওয়ার্ড যেখানে সবাই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর সম্পূর্ণ সচেতন। যেখানে সোর্স সেগ্রিগেশন হবে; যেখানে-সেখানে বর্জ্য ফেলবে না, রাস্তা-ঘাট ও ডেন পরিষ্কার, সবাই পৌরসভার ভ্যানে নিয়মিত বর্জ্য দেয় এবং সার্ভিস চার্জ পরিশোধ করে। উক্ত ওয়ার্ড থেকে শিক্ষণীয় বিষয় নিয়ে পরবর্তী মডেল ওয়ার্ড তৈরি করা হবে। এভাবে আস্তে আস্তে ব্যবসায়িক পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পূর্ণ শহরকে একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শহর হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

Temporary Waste Collection Workflow: Step-Step Process

Optimizing Waste Logistics for Urban Cleanliness



মানদণ্ড ঠিক করা

বর্জ্য ব্যবস্থাপনার একটি মানদণ্ড বা স্ট্যান্ডার্ড সেটিং করা হবে। প্রত্যেকটি এলাকায় সেটি ব্যানার বা সাইনবোর্ড স্থাপন করে জানানো হবে যে, উক্ত এলাকা থেকে কখন বর্জ্য সংগ্রহ করা হবে, কোন ধরনের বর্জ্যের সার্ভিস চার্জ কত, এমনকি বিল্ডিংগুলোর কত তলা পর্যন্ত কত টাকা সার্ভিস চার্জ, ইত্যাদি। যাতে এলাকাবাসীর বর্জ্য সংগ্রহ সেবা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকে এবং উঁচু বিল্ডিংগুলোর মালিকেরা বিল্ডিংয়ের নিচে বর্জ্য রাখার বিন স্থাপন করে। এর ফলে বর্জ্য সংগ্রহকারীর অনেক সময় বেঁচে যাবে এবং কম সময়ে অধিক গ্রাহকদের সেবা প্রদান করতে সক্ষম হবে।

গ্রাহক অভিযোগ নিষ্পত্তি

- গ্রাহক কোন বিষয়ে অভিযোগ দিলে সেটা অতি দ্রুত সমাধান গ্রহণ করতে হবে। কোন সমস্যার সমাধান করতে না পারলে গ্রাহককে সেটা বুঝিয়ে বলতে হবে।
- একটি হট নাম্বার চালু করা প্রয়োজন যেখানে গ্রাহক তার অভিযোগ জানাবে। এর মাধ্যমে কর্মকর্তার কর্ম এলাকা থেকে কতগুলো অভিযোগ এসেছে তার হিসাব করা যাবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

পৌরসভার সাথে সমন্বয়

- বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট পৌরসভার সকল কর্মকর্তাদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের অগ্রগতি অবগত করা নিয়মিতভাবে।
- গ্রাহক বৃদ্ধির জন্য পৌরসভার সহযোগিতা নিয়ে সকল কার্যক্রম করা। যেমনঃ মাইকিং, সচেতনতামূলক সভা, ডাস্টবিন ভাঙ্গা, অবৈধ ডাম্পিং স্টেশন উচ্ছেদ করা, বাজার কমিটির সাথে মিটিং, সুউচ্চ অট্টালিকাগুলোর মালিকপক্ষের সহিত মিটিং, লিফলেট বিতরণ ইত্যাদি।
- পৌরসভার সহিত ত্রৈমাসিক সভায় পরবর্তী তিন মাসের কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করা এবং সেখানে কোন কাজের জন্য পৌরসভার কোন ধরনের সহযোগিতা প্রয়োজন হবে সেটা পৌরসভার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অবগত করা।

উচ্চ অট্টালিকাগুলো থেকে বর্জ্য সংগ্রহ

পঞ্চম তলা থেকে বেশি তলা বিশিষ্ট বিল্ডিংগুলো থেকে বর্জ্য সংগ্রহের জন্য বিল্ডিংয়ের নিচে একটি ডাস্টবিন রাখার ব্যবস্থা করার জন্য পৌরসভার সার্বিক সহযোগিতায় বিল্ডিং মালিকের সহিত মিটিং করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সেখান থেকে যেমন সম্মিলিতভাবে একটি জায়গা থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করা হবে তেমনি একটি জায়গা থেকে অর্থাৎ বিল্ডিং কেয়ারটেকার বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি নিকট হতে বর্জ্য সংগ্রহের সার্ভিস চার্জ সংগ্রহ করতে হবে। তবে সেক্ষেত্রে প্রত্যেক তলার সার্ভিস চার্জ সমান হবে।

বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য সংগ্রহ

বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বর্জ্য সংগ্রহের সেবা প্রদানের মাধ্যমে এই কার্যক্রমকে কম সময়ের ভিতর লাভজনক করা যায়। কারণ, তাদের নিকট হতে বাসা-বাড়ির তুলনায় বেশী সার্ভিস চার্জ পাওয়া যায়। যেমন-স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, দোকান, কাঁচা বাজার ইত্যাদি। তবে এর জন্য বাজার কমিটির সাথে পৌরসভার সমন্বয়ে সভার মাধ্যমে বর্জ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া ও সার্ভিস চার্জ নির্ধারণ করতে হবে।

সুসংগঠিত সিস্টেম অবতারণা

একটি সফটওয়্যার তৈরির মাধ্যমে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সকল কার্যক্রমকে ব্যবস্থা করা; যেমন- বর্জ্য সংগ্রহ, সার্ভিস চার্জ গ্রহণ, গ্রাহক ব্যবস্থাপনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, মাসিক প্রতিবেদন তৈরি, কর্ম মূল্যায়ন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। যেন কোনো ধরনের আর্থিক অনিয়মের সম্ভাবনা বা সুযোগ না থাকে।

বর্জ্য পুনর্ব্যবহার ও বিক্রয় কৌশল

- বাসা বাড়ি থেকে সংগৃহীত বর্জ্যের পুনর্ব্যবহারের পরিমাণ বাড়ানো। তার জন্য বর্তমান চলমান পদ্ধতির পাশাপাশি নতুন কোনো আধুনিক পদ্ধতির অবতারণা করা (যেমন-হিপ পদ্ধতি), যাতে কম সময়ে অধিক পরিমাণ বর্জ্য সম্পদে পরিণত করা যায়।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ডাম্পিং স্টেশন খালি করার জন্য দুই বা ততোধিক স্তর বিশিষ্ট বড় থেকে ছোট ছিদ্রওয়ালা ছাকনি ব্যবহার করা। সেখান থেকে প্রাপ্ত জৈব অংশকে চূর্ণ করে জৈব সারে রূপান্তরিত করে বিক্রয় করা এবং অজৈব অংশকে যথাযথভাবে ব্যবস্থাপনা করা।
- যেকোনো ধরনের মেলা, সামাজিক মাধ্যম বা ক্যাম্পেইন, স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তাদের ও কৃষি ইনপুট বিক্রেতাদের সহযোগিতার মাধ্যমে জৈব স্যারের প্রচার প্রচারণা বৃদ্ধির মাধ্যমে জৈব সারের চাহিদা সৃষ্টি করা।



কর্মীদের বাৎসরিক মূল্যায়ন বিধি

কর্মীদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কাজের উপর ভিত্তি করে প্রত্যেকটা কাজের ওয়েট নির্ধারণপূর্বক একটি কর্মী মূল্যায়ন বিধি তৈরি করা যেতে পারে; যা কর্মীদের জানানো হবে এবং বছর শেষে সেই অনুযায়ী তাদের মূল্যায়ন করা হবে; যা তাদের বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধিতে বা প্রমোশনের ক্ষেত্রে সরাসরি প্রভাব ফেলবে।

নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি পরিধান

বর্জ্য সংগ্রহকারী ভ্যানচালকগণ, বর্জ্য আলাদাকরনকারীগণ, প্লান্ট অপারেটর সহ সবাই প্রয়োজন সাপেক্ষে যথাযথ ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি পরিধান করবেন। অপারেটর তাদের নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি সরবরাহ করবে। কর্মরত অবস্থায় কোন দুর্ঘটনায় কবলিত হলে যথাযথ ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি পরিধান করা ছিল কিনা সেটা খতিয়ে দেখা হবে এবং তার উপর ভিত্তি করে দুর্ঘটনা কবলিত ব্যক্তিকে অফিসের সুবিধা প্রদান করা হবে।

চিকিৎসা ও জীবন বীমা সেবা

- কর্মরত অবস্থায় কোন ব্যক্তি যথাযথ নিরাপত্তা সামগ্রী পরিধান করা সত্ত্বেও দুর্ঘটনায় কবলিত হলে অপারেটর তার চিকিৎসার দায়ভার গ্রহণ করবে।
- প্রত্যেকটা কর্মীকে জীবন বীমার আওতায় আনা হবে। যার খরচ অপারেটর বহন করবে।

মাসিক সভা/ প্রশিক্ষণ

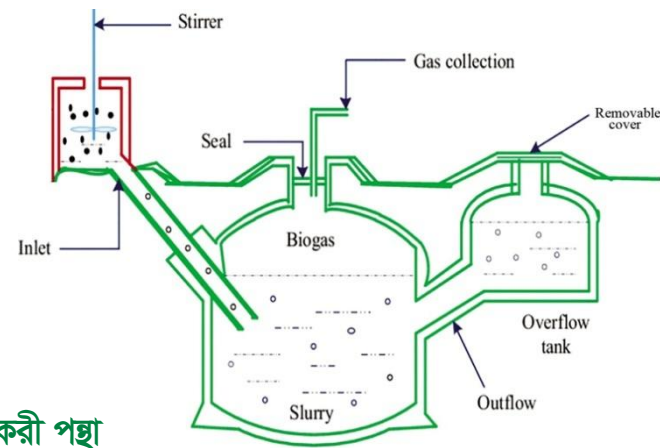
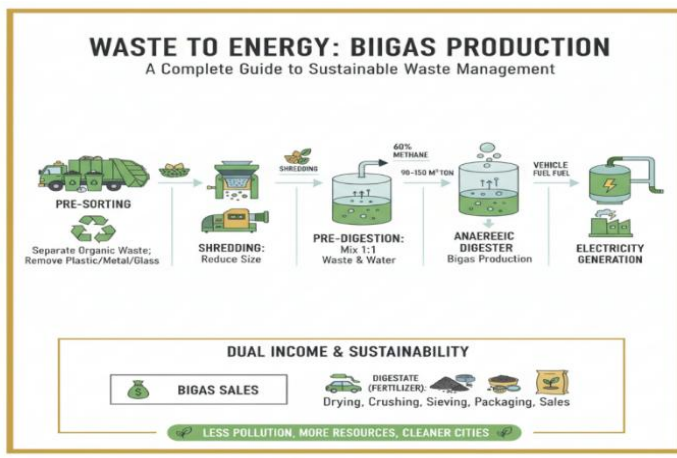
প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী মাসের অগ্রগতি, কর্মীদের দায়িত্ব পালন, চলতি মাসের কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদি নিয়ে সভা করা হবে। প্রয়োজনে কর্মীদের কোন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজন হলে তা অনুষ্ঠিত করা হবে। এ ব্যাপারে প্রকল্প ব্যবস্থাপক সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে টেকসই ও কার্যকর করার উদ্দেশ্যে নিম্নে বর্ণিত কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

- **সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম:** আমাদের দেশের সাধারণ জনগন মোটেই পয়ঃবর্জ্যের ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে অবগত ও সচেতন নয়। তারা মনে করে একটি স্যানিটারি ল্যাট্রিন থাকলেই স্যানিটেশন বিধিমালা পালন করা হয়ে গেলো! কিন্তু শৌচকর্ম করার পরবর্তীতে ডাইজেষ্টেট পয়ঃবর্জ্য যে আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য কতখানি ক্ষতিকর তা আমরা বুঝতে চাই না। তাই কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের যে সচেতনতামূলক প্রোগ্রামের আয়োজন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে সেসব প্রোগ্রামে একসাথে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়েও কাজ করতে হবে। জনগণকে সেফলি ম্যানেজড স্যানিটেশন সিস্টেম সম্পর্কে অবগত করে পয়ঃবর্জ্য বিষয়ে সচেতন করে তোলা হবে।
- **পয়ঃবর্জ্য সেবা ডেস্ক:** পৌরসভায় একটি পয়ঃবর্জ্য সেবা ডেস্ক এবং হটলাইন (মার্চেন্ট নম্বর) চালু করা হবে। জনসাধারণ হটলাইনের মাধ্যমে অথবা পয়ঃবর্জ্য সেবা ডেস্ক এ এসে তাদের শৌচাগার খালি করার আবেদন জানাবে। একজন কর্মকর্তা সকল আবেদনের বিস্তারিত তথ্য নথিভুক্ত করে সংশ্লিষ্ট পয়ঃবর্জ্য সেবা প্রদানকারীকে জানাবে। পয়ঃবর্জ্য সেবা প্রদানকারী সরেজমিনে উক্ত শৌচাগার পরিদর্শন করে সেবা প্রদানের তারিখ ও সময় গ্রাহককে অবগত করবে। সেবা প্রদান শেষে গ্রাহক উক্ত হটলাইন (মার্চেন্ট নম্বর) এ তার সার্ভিস চার্জ পরিশোধ করবে।
- **জিপিস মেশিন স্থাপন:** প্রত্যেকটি ভেকু ট্যাগের সহিত একটি জিপিস মেশিন স্থাপন করা হবে এবং পরবর্তী দিন সকালে প্রকল্পের ব্যবস্থাপক খতিয়ে দেখবেন যে কোন গাড়ি কতটি ট্রিপ দিয়েছে। ব্যবস্থাপক উক্ত ট্রিপসংখ্যার সহিত বিল পরিশোধের সংখ্যা মিলিয়ে দেখবেন।
- **অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ:** আমরা জানি শহরের প্রায় ৭০ ভাগ সেপটিক ট্যাংক বা পিট ল্যাট্রিনের সংযোগ ড্রেন বা যেকোনো ধরনের পানির উৎসের সহিত। তাই এই অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব না হলে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে কোনদিনই লাভজনক করা সম্ভব হবে না। তাই পৌরসভার সহযোগিতায় সেপটিক ট্যাংক বা পিট ল্যাট্রিনের অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং তার পাশাপাশি এ ব্যাপারে জনগণকে সচেতন করে গড়ে তুলতে হবে; যাতে তারা নিজেরাই সকল অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে।
- **প্রশিক্ষণ ও নিরাপত্তা সামগ্রী ব্যবহার:** সকল পরিছন্নতা কর্মীদের নিরাপত্তা সামগ্রী ব্যবহার বাধ্যতামূলক এবং সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। তার পাশাপাশি তাদেরকে প্রাহকের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন, আচরণবিধি ইত্যাদি বিষয়ের উপর মাঝেমাঝে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।
- **সফটওয়্যারের মাধ্যমে গ্রাহক সেবা বৃদ্ধি:** পৌরসভার সকল হোল্ডিং মালিকদের সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রতি তিন বছর অন্তর তাদের সেপটিক ট্যাংক খালি করার মেসেজ প্রদান করতে হবে এবং মেসেজে তারিখ উল্লেখপূর্বক বাধ্যতামূলকভাবে তাকে সেবা প্রদান করতে হবে।





৩.৬ Waste to Energy: বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সর্বোত্তম কার্যকরী পদ্ধতি

"Waste to Energy" হলো আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার একটি কার্যকরী মডেল, যেখানে শহরের সংগৃহীত বর্জ্যকে পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে শক্তি এবং মূল্যবান সম্পদ-উভয়ই উৎপাদন করা হয়। জৈব বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তরের জন্য বায়োগ্যাস উৎপাদন হলো এই পদ্ধতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়।

বায়োগ্যাস হলো বিভিন্ন গ্যাসের একটি মিশ্রণ, যা পচনশীল জৈব পদার্থকে অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে (Anaerobic Digestion) অণুজীবের মাধ্যমে বিয়োজিত করে উৎপন্ন করা হয়।

- **প্রধান উপাদান:** এই গ্যাসে প্রধানত মিথেন (CH_4) (৬০% বা তার বেশি) এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) (প্রায় ৩৮% বা কম) থাকে।
- **অন্যান্য উপাদান:** অল্প পরিমাণে হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S) এবং অন্যান্য গ্যাসও থাকতে পারে।

বায়োগ্যাসের ব্যবহার: উৎপাদিত এই গ্যাস বহুবিধ কাজে ব্যবহৃত হয়:

- **রান্নার জ্বালানি:** সরাসরি গৃহস্থালী রান্নার কাজে ব্যবহার।
- **বিদ্যুৎ উৎপাদন:** জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে গ্রিডে সরবরাহ।
- **যানবাহনের জ্বালানি:** গ্যাসকে পরিশোধন করে যানবাহনে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার।

বায়োগ্যাস উৎপাদনের পদ্ধতি: অ্যানেরোবিক ডাইজেশন

বায়োগ্যাস উৎপাদনের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত প্রক্রিয়াটি হলো অ্যানেরোবিক ডাইজেশন (Anaerobic Digestion), অর্থাৎ বায়ুর অনুপস্থিতিতে জৈব বর্জ্য পঁচানো।

ধাপে ধাপে প্রক্রিয়া

ধাপ	প্রক্রিয়া	বিবরণ
বর্জ্য পৃথকীকরণ (Pre-Sorting)	জৈব ও অজৈব বর্জ্য আলাদা করা	সংগৃহীত কঠিন বর্জ্য থেকে পঁচনশীল জৈব বর্জ্যকে (খাবার, সবজির উচ্ছিন্ন) আলাদা করা হয়। প্লাস্টিক, কাঁচ, ধাতু ইত্যাদি অজৈব পদার্থ সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া অত্যাবশ্যক।
সাইজিং (Sizing)	বর্জ্যকে ছোট টুকরা করা	পঁচনশীল বর্জ্যগুলোকে শ্রেডার মেশিন (Shredder Machine) ব্যবহার করে ছোট ছোট টুকরায় কাটা হয়। এটি ডাইজেস্টারে অণুজীবের কাজ এবং পাইপের মধ্য দিয়ে প্রবাহ সহজ করে।
প্রি-ডাইজেস্ট ও মিক্সিং (Mixing)	সাসপেনশন তৈরি	এই স্তরে সমপরিমাণ বর্জ্য ও পানি একত্রে মেশানো হয়। এই মিশ্রণ একটি চেম্বারে রাখা হয়, যা ইনলেট পাইপের মাধ্যমে মূল ডাইজেস্টারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। বর্জ্যকে পাইপের মধ্য দিয়ে সহজে প্রবাহের উপযোগী করে কাটতে হয়।
গ্যাস উৎপাদন (Digestion)	বায়োগ্যাস সৃষ্টি	বর্জ্যগুলো ডাইজেস্টারের মূল অংশে প্রবেশ করে। বায়ুর অনুপস্থিতিতে অণুজীবের মাধ্যমে ডি-কম্পোজিট (Decomposition) প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং বায়োগ্যাস উৎপন্ন হয়।
গ্যাস সংগ্রহ ও বিতরণ	সরবরাহ প্রক্রিয়া	উৎপাদিত বায়োগ্যাস নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পাইপের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রাহক (বাসা-বাড়ি বা শিল্প কারখানা)-এর কাছে সরবরাহ করা হয়।

কার্যকারিতা প্রভাবিতকারী উপাদান:

বায়োগ্যাস উৎপাদনের দক্ষতা কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারিগরি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে:

- **কার্বন ও নাইট্রোজেনের অনুপাত (C/N Ratio):** আদর্শ অনুপাত বজায় রাখা (প্রায় ২৫:১ থেকে ৩০:১) অপরিহার্য।
- **অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা:** ডাইজেস্টারের ভেতরের তাপমাত্রা (মেসোফিলিক বা থার্মোফিলিক রেঞ্জ) স্থিতিশীল রাখা।
- **আর্দ্রতা ও pH মাত্রা:** সঠিক আর্দ্রতা এবং pH (অম্লত্ব/ক্ষারত্ব) এর মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা।

অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সুবিধা

বৃহৎ পরিসরে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্ল্যান্টে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা শহরের বর্জ্য পুনর্ব্যবহারের সর্বোত্তম পন্থা হিসেবে বিবেচিত।

- **দৈত আগের সুযোগ:** এই পদ্ধতি অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত লাভজনক, কারণ এটি একই বর্জ্য থেকে দুইবার আয় করার সুযোগ দেয়:

১. প্রথম আয়: উৎপাদিত বায়োগ্যাস বিক্রি করে।

২. দ্বিতীয় আয়: বায়োগ্যাস উৎপাদনের পর প্ল্যান্ট থেকে নির্গত বর্জ্যকে জৈব সারে রূপান্তর করে।

- **জৈব সার উৎপাদন:** ডাইজেস্টারের গ্যাস উৎপাদনের পর অবশিষ্ট পদার্থকে ডাইজেস্টেট (Digestate) বলে। এই ডাইজেস্টেট হলো উচ্চমানের জৈব সারের কাঁচামাল। ডাইজেস্টেট তুলে ছায়াযুক্ত স্থানে শুকিয়ে, মেশিন দ্বারা চূর্ণ করে এবং চালনি দিয়ে ছেঁকে নিলে উৎকৃষ্ট মানের জৈব সার তৈরি হয়, যা বিক্রি করে বিপুল পরিমাণ অতিরিক্ত আয় সম্ভব।
- **পরিবেশগত সুফল:** এই পদ্ধতিতে ১ টন ভেজা জৈব বর্জ্য থেকে আনুমানিক ৯০-১৫০ ঘন মিটার বায়োগ্যাস পাওয়া যায়। এটি জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে পরিবেশের ওপর চাপ কমায়।



৩.৭ বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ব্ল্যাক সোলজার ফ্লাই (BSF): কম খরচে কার্যকরী পন্থা

ভূমিকা: কেন BSF দরকার

আমরা প্রতিদিন রান্নাঘর, বাজার বা খামার থেকে যে ভেজা বর্জ্য যেখানে-সেখানে ফেলি, তা পরিবেশ ও জীবস্বাস্থ্যের বিবিধ ক্ষতিসাধন করে। কিন্তু আমাদের আর্থিক অসচ্ছলতা ও অসচেতনতার কারণে এগুলোকে যথযথভাবে ব্যবস্থাপনা করা দিনে দিনে কঠিন হয়ে আরও ভয়াবহ অবস্থা ধারণ করছে। ব্ল্যাক সোলজার ফ্লাই (Black Soldier Fly, BSF) সেই বর্জ্য কয়েক দিনের মধ্যে উচ্চ-প্রোটিন লার্ভা ও জৈব সার (ফ্রাস)-এ রূপান্তর করতে পারে। এতে বর্জ্য কমে, খামারের খাবার পাওয়া যায় এবং জমির জন্য ভালো সার তৈরি হয়।

BSF কী এবং কীভাবে কাজ করে

BSF এর জীবনচক্র হলো ডিম → লার্ভা → প্রি-পিউপা → পিউপা → প্রাপ্তবয়স্ক মাছি। কাজের আসল নায়ক হলো লার্ভা, কারণ ওরা দিন-রাত খেয়ে বর্জ্যকে পুষ্টিতে ভরাট দেহে পরিণত করে। প্রাপ্তবয়স্ক BSF খাবার খায় না, রোগ ছড়ায় না এবং ঘরে বিরক্তও করে না।

কী খায় এবং কী দেয়

- BSF লার্ভা রান্নাঘর ও বাজারের ভেজা বর্জ্য, ফল-সবজি, খাদ্যশিল্পের স্লারি বা পোলট্রি/ডেইরির মল খেতে পারে; তবে রাসায়নিক, তেল-চর্বি, চিকিৎসা বর্জ্য বা প্লাস্টিক দেওয়া যাবে না।
- এই প্রক্রিয়া থেকে আমরা দুটি জিনিস পাই: লার্ভা, যা শুকিয়ে মাছ বা মুরগির খাদ্য হিসেবে দেওয়া যায়; এবং ফ্রাস, যা পটাশ-সমৃদ্ধ জৈব সার হিসেবে জমিতে ব্যবহার করা যায়।
- সাধারণভাবে বলা যায়, ১ টন ভেজা ভেজিটেবল-বর্জ্য থেকে ৫০-১০০ কেজি শুকনো লার্ভা এবং ২০০-৩০০ কেজি ফ্রাস পাওয়া সম্ভব, আর বর্জ্যের মোট ওজন ৫০-০% কমে যায়।



কোথায় বসানো যায়

বাংলাদেশের তাপমাত্রা (২৫-৩২°C) ও আদ্রতা এর জন্য বেশ উপযোগী। ছোট স্কেলে এটি স্কুল, বাজার বা ওয়ার্ড পর্যায়ে ট্রে-ভিত্তিক শেড করা যায়; মাঝারি স্কেলে পৌর ট্রান্সফার-পয়েন্ট বা খামার-ক্লাস্টারে করা ভালো; আর বড় স্কেলে যার্ক, শ্রেডার ও ড্রায়ারসহ আধুনিক প্ল্যান্ট বসিয়ে প্রতিদিন কয়েক টন বর্জ্য প্রসেস করা যায়।

ধাপে ধাপে কীভাবে করবেন (সরল SOP)

- **উৎসে বাছাই করুন:** প্লাস্টিক, কাচ, ধাতু ও রাসায়নিকযুক্ত জিনিসগুলো আগে থেকেই আলাদা করুন, যাতে ট্রেতে শুধু ভেজা খাবারই থাকে।
- **বর্জ্য কুচি ও মিশ্রণ করুন:** বর্জ্যকে ছোট টুকরা করে সামান্য ধান-ভুসি বা কাঠ-গুঁড়া মেশান, যাতে আর্দ্রতা মাঝামাঝি থাকে এবং গন্ধ কমে।
- **লার্ভা ছড়িয়ে দিন:** প্রতি কেজি বর্জ্যে সামান্য (১-৫ গ্রাম) করে ৩-৫ দিনের লার্ভা ছড়িয়ে দিন, যাতে সবাই সহজে খাবার পায়।
- **পাতলা স্তরে দিন:** ট্রেতে বর্জ্য ৩-৫ সেমির বেশি পুরু করবেন না, যাতে অতিরিক্ত গরম না হয় এবং লার্ভা দ্রুত খেতে পারে।
- **স্বয়ংক্রিয় সংগ্রহ করুন:** ১০-১২ দিনে লার্ভা প্রি-পিউপা হলে র‍্যাম্প বেয়ে নিজে থেকেই সংগ্রহ-বাক্সে ওঠে; না হলে চলন-জাল দিয়ে আলাদা করে নিন।
- **প্রসেসিং ঠিকমতো করুন:** লার্ভা ২-৩ মিনিট গরম পানিতে ডুবিয়ে জীবাণুমুক্ত করে ৬০-৮০°C-এ শুকিয়ে নিন; ফ্রাস ১-২ সপ্তাহ কিউরিং করে ছেকে প্যাকেট করুন।
- **পরিচ্ছন্নতা মানুন:** কাজের সময় গ্লাভস ও মাস্ক ব্যবহার করুন, ট্রে ও ঘর নিয়মিত ধুয়েমুছে পরিষ্কার রাখুন এবং ইঁদুর-পোকা ঢোকা বন্ধ করুন।

চালানোর সময় ছোট টিপস

- যদি গন্ধ বেড়ে যায়, তাহলে ভুসি আরেকটু বাড়িয়ে পাতলা স্তরে দিন এবং ট্রের ঢাকনা বা জালি ঠিকভাবে লাগান।
- যদি লার্ভা মরতে শুরু করে, বুঝবেন অতিরিক্ত গরম বা অম্লত্ব বেড়ে গেছে; সেই ক্ষেত্রে পাতলা স্তর দিন এবং সামান্য চুন বা বায়োচার মিশিয়ে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনুন।
- যদি বাজার না পান, আগে থেকেই কাছের ফিড-মিল, হ্যাচারি বা নার্সারির সঙ্গে কথা বলে নিন, যাতে নিয়মিতভাবে ক্রয়-বিক্রয় চলতে পারে।

নিরাপত্তা ও মান

BSF দ্রুত বর্জ্য খেয়ে ফেলায় সাধারণত দুর্গন্ধ কম থাকে; তবু শুকানোর আগে লার্ভা ব্যাধিগ্রস্ত করলে খাদ্য-নিরাপত্তা আরও ভালো থাকে। কোনোভাবেই ভারী ধাতু বা রাসায়নিক মিশ্রিত বর্জ্য ব্যবহার করবেন না। ফ্রাস জমিতে দেওয়ার আগে অল্প সময় কিউরিং করলে গাছের জন্য নিরাপদ হয়।

অর্থনীতি ও বাজার

এই খাতে আয় আসে তিন জায়গা থেকে: শুকনো লার্ভা/ল্যার্ভা-মিল/ল্যার্ভা-অয়েল বিক্রি, ফ্রাস-সার বিক্রি, এবং পৌরসভার সঙ্গে কাজ করলে বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতের সেবা-ফি। খরচ মূলত শেড, ট্রে, শ্রেডার, ড্রায়ার ও শ্রমে হয়। নিয়মিত বর্জ্য-সরবরাহ আর স্থায়ী ক্রেতা থাকলে ছোট সেটআপও ভাল লাভ দেখায়। আবার যথাযথ প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা থাকলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে “কার্বন ক্রেডিট” পাওয়ার মাধ্যমে আয় করা সম্ভব।

কোথায় সবচেয়ে মানানসই

পৌর বাজার, বড় হোটেল-ক্যান্টিন, পোল্ট্রি/ফিশ-খামার ক্লাস্টার এবং স্কুল ক্যাম্পাস এসব জায়গায় নিয়মিত ভেজা বর্জ্য পাওয়া যায়, তাই এখানেই BSF সবচেয়ে কার্যকরভাবে চালানো যায়। নার্সারির কাছাকাছি হলে ফ্রাস-সারের তাত্ক্ষণিক বাজারও মিলতে পারে।

উপসংহার

BSF-কে আপনি বর্জ্য খাওয়ানো এক প্রাকৃতিক ছোট কারখানা ভাবতে পারেন। কয়েক দিনের মধ্যে এটি ভেজা বর্জ্যকে পশুখাদ্য ও জৈব সারে বদলে দেয়। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় এ পদ্ধতি সহজে মানিয়ে চলে, খরচ কমায় এবং আয়ের নতুন পথ খুলে দেয়। পরিকল্পনা ও পরিচ্ছন্নতা ঠিক থাকলে BSF আপনার কমিউনিটি বা প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যকর, লাভজনক ও টেকসই বর্জ্য-সমাধান হতে পারে।

অধ্যায়-০৪
বজ্র্য থেকে আয়
ও
কর্মসংস্থান সৃষ্টি





৪.১ বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় যুব সমাজের ভূমিকা

ভূমিকা

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা মূলত আচরণ বদল, ছোট ছোট নিয়ম মানা, আর নতুন সমাধান খোঁজার কাজ। প্রশ্নটি সহজ: “আজ আমি কী করলে কালকের শহরটা একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হবে?” আর তাইতো অতীতের মতো আবারও এই দিন বদলের শুরু হোক তরুণদের হাত ধরেই। শহরের বর্জ্য সমস্যা একদিনে তৈরি হয়নি এটি আমাদের প্রতিদিনের ছোট ছোট ভুল অভ্যাসের ফল। তাই সমাধানটাও আসবে প্রতিদিনের ছোট ছোট অভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমেই। এখানে তরুণদের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তারাই দ্রুত শেখে, দ্রুত শিখিয়ে দিতে পারে, আর নতুন আইডিয়া নিয়ে কাজ শুরু করতে সাহস পায়। নিজের ঘর থেকে শুরু করে মহল্লা, স্কুল-কলেজ, এমনকি স্থানীয় প্রশাসন পর্যন্ত-সব জায়গায় তরুণরা বাস্তব পরিবর্তন আনতে পারে।

ব্যক্তিগত অভ্যাসে পরিবর্তন

তরুণদের আগে নিজেকে পরিবর্তন করে নিম্নে বর্ণিত ৫R নীতি (যা সাধারণতঃ প্লাস্টিক বর্জ্যের ক্ষেত্রে বেশী প্রযোজ্য) মেনে চলতে হবে; এরপর বাড়িতে সেটা অভ্যস্ত করানোর পর এলাকাবাসীকে অভ্যস্ত করানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তাহলে আসুন এবার আমরা জানার চেষ্টা করি ৫R নীতি সম্পর্কে-

Refuse (প্রত্যাখ্যান): প্লাস্টিক বর্জ্যকে ‘না’ বলা-অর্থ্যাৎ যতটা সম্ভব ব্যক্তিগত কাজে এবং বাড়ীতে প্লাস্টিকজাত পণ্য (যেমন- পাতলা পলিথিন, প্যাকেট, বোতল, কন্টেইনার ইত্যাদি) ব্যবহার না করা। এক্ষেত্রে, বিকল্প ব্যবস্থা করা। যেমন- বাজার করতে কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহার করা। দোকানদার দিলে না নেওয়া।

Reduce (হ্রাস): যতটা সম্ভব প্লাস্টিকজাত পণ্যের ব্যবহার কম করা। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই বর্জ্যের উৎপাদন কমে আসবে।

Reuse (পুনর্ব্যবহার/একই কাজে পুনরায় ব্যবহার): কোনো পণ্যকে তাড়াতাড়ি বর্জ্যে রূপান্তরিত না করে তাকে সেই একই কাজে বারবার ব্যবহার নিরাপদ হলে ব্যবহার করা। যেমন- কাঁচের জার, পানির বোতল, কাপড়ের ব্যাগ-এসব বহুবার ব্যবহার করা। তবে, প্লাস্টিকজাত পণ্যের ক্ষেত্রে পুনর্ব্যবহার স্বাস্থ্যসম্মত না হলে মোটেই করা যাবে না।

Repurpose (নতুন কাজে ব্যবহার): বর্জ্যকে সামান্য পরিবর্তন করে বা না করে (কোনোরকম প্রক্রিয়াজাতকরণ ছাড়াই) নতুন কাজে সেটা ব্যবহার করা। যেমন- পুরনো কাপড় দিয়ে বাজার-ব্যাগ, কাঁচের বোতলে গৃহস্থালীর জিনিস রাখা, প্লাস্টিকের বোতল কেটে টব, শো পিস ইত্যাদি, পুরাতন কাগজ থেকে প্যাকেট তৈরী ইত্যাদি।

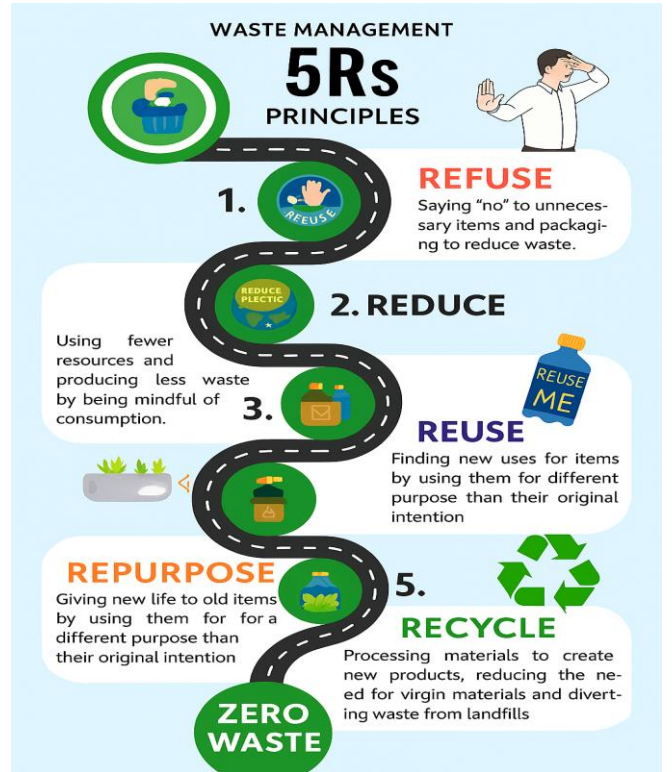
Recycle (পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ): বর্জ্যকে প্রক্রিয়া করে সম্পূর্ণ নতুন পণ্য তৈরী করা। যেমন-জৈব বর্জ্য থেকে জৈব সার উৎপাদন, প্লাস্টিক বা ধাতব বর্জ্য গলিয়ে নতুন পণ্য তৈরী, ইত্যাদি।

উপরের ০৫টি নীতি মেনে চললে ধীরে ধীরে শহরকে “জিরো ওয়েস্ট”-এ রূপান্তরিত করা সম্ভব।

কমিউনিটি ও সামাজিক উদ্যোগ

পাড়ার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অবগত করে বা উপস্থিত করে বন্ধুদের নিয়ে নিজের মহল্লায় ছোট কাজ শুরু করা-আর সেখানেই পরিবর্তনের বীজ। যেমন-

- সপ্তাহে একদিন পরিচ্ছন্নতা দিন: পথের ধারে বা ড্রেনের মুখ থেকে আবর্জনা তুলে ডাস্টবিনে দেওয়া, “এখানে বর্জ্য ফেলবেন না” সাইনবোর্ড টাঙানো। এ দিনটির ছবি-ভিডিও দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে ধরো-অন্যরাও অনুপ্রাণিত হবে।
- কমিউনিটি কম্পোস্টিং: মহল্লার বাসা-বাড়িতে সোর্স সেগ্রিগেশন শুরু করতে পারো ছোট ছোট সচেতনতামূলক প্রোগ্রামের মাধ্যমে



সচেতন করে তুলে। এলাকায় ডোর টু ডোর বর্জ্য সংগ্রহের সেবা প্রদানের মাধ্যমে আয়ও করা যেতে পারে। আবার সংগৃহীত বর্জ্য রিসাইক্লিং করেও আয় করা ও পরিবেশের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। যেমন-জৈব বর্জ্য একটি গর্তে/ ড্রামে/ কনক্রিটের চেম্বারে অন্যান্য উপাদান (গোবর, কাঠের গুড়া, ছাঁই ইত্যাদি) মিশিয়ে কমপক্ষে ৪৫ দিন পঁচিয়ে ভালো মানের জৈব সার তৈরী করা যেতে পারে। গ্রামীন এলাকা হলে গ্রামবাসীদের “গর্ত পদ্ধতি”-তে জৈব সার উৎপাদন করিয়ে সেটা ক্রয় করে প্যাকেজিং করে ব্যবসা করা যেতে পারে (বিস্তারিত পরে)।

- **স্কুল-কলেজে গ্রীন ক্লাব:** স্কুল-কলেজে ছোট ছোট ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে তাদেরকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সচেতন করে সেখানে সোর্স সেগ্রিগেশন শুরু করা, “শূন্য প্লাস্টিক সপ্তাহ” পালন, দেয়ালপত্রিকা/নাটিকা/পোস্টার-ইত্যাদির আয়োজন করা। তাহলে তাদের মাধ্যমে তাদের বাড়ীতে এই অভ্যাস শুরু হবে এবং আগামী প্রজন্ম বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সচেতন প্রজন্ম হিসেবে গড়ে উঠবে।
- **সিটি কর্পোরেশনের সঙ্গে সংযোগ:** এলাকার বর্জ্য সমস্যার সমাধানে একটি দল গঠন করে পদক্ষেপ গ্রহণ করা। যেমন-কোথায় ডাস্টবিন দরকার, কোথায় ড্রেন বক্স, কোথায় বৈধভাবে বর্জ্য ফেলে পরিবেশ দূষিত করছে, কোথায় রাস্তা ভাঙ্গা ইত্যাদি সমস্যার সমাধানে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আর তাহলেই এলাকাবাসীর যুব সংগঠনের প্রতি আস্থা তৈরী হবে। তখন এলাকাবাসীকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রতি আগ্রহী করে তোলা সহজ হবে।

উদ্ভাবনী ও নেতৃত্বমূলক কাজ

তরুণ মানেই নতুন সমাধান। তরুণেরা প্রযুক্তি ব্যবহার করে খুব দ্রুত সমাধান বানাতে পারে-ছোট করে শুরু হলেও ফল দৃশ্যমান হয়। যেমন-

- **রিপোর্ট- অ্যাপ/অনলাইন ফ্রপ:** কোথায় আবর্জনা জমেছে, কোন ডাস্টবিন ওভারফ্লো-ম্যাপে লোকেশন দাও; সপ্তাহে একবার সেই তালিকা পৌরসভায় জমা দাও। ধারাবাহিকতা দেখলে কর্তৃপক্ষও সাড়া দেয়।
- **আপসাইক্লিং কর্মশালা:** বোতল দিয়ে শো পিস, টায়ার দিয়ে বসার টুল, পুরাতন কাপড় দিয়ে ব্যাগ, টিস্যুর বক্স দিয়ে ছোট ছোট জিনিস রাখার কন্টেইনার-এগুলো বানিয়ে মেলায়/স্থানীয় বাজারে বিক্রি করা।
- **সাবস্ক্রিপশন কালেকশন:** মাসে নির্দিষ্ট দিনে শুকনা রিসাইক্লেবল বর্জ্য সংগ্রহ; ওজন অনুযায়ী ছোট ইনসেন্টিভ। তাহলে মানুষ সেটা ফেলে না দিয়ে জমিয়ে রাখবে। তোমরাও নিয়মিত দল গড়ে সংগ্রহ করে নিতে পারবে। সবচেয়ে জরুরী-ডেটা রাখো: কত কেজি সংগ্রহ হলো, কজন অংশ নিল, কতটা বর্জ্য রিসাইক্লিং হলো। প্রমাণ থাকলে সমর্থন ও সহযোগিতা দুটোই বাড়ে।



সচেতনতা প্রচার ও সমন্বিত নেতৃত্ব

একা কাজটি করা কঠিন। দল বেঁধে করলে কাজটি সহজ হয়-অনেক বেশি প্রভাব পড়ে।

- পরিবার-বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ম পাকাপাকি করো: ঘরে তিন-বিন, বাজারে নিজের ব্যাগ, ড্রেনে কিছু না ফেলা-এগুলোকে পরিবারের “হোম-রুল” বানাও।
- সোশ্যাল ক্যাম্পেইন: এলাকায় “পরিবেশ ক্লাব” গঠন করে নিয়মিত কাজ করা, হ্যাশট্যাগ-ধরা যাক # পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ, # ড্রেনে-নয়-ভ্যানে, # তিনবিন-চ্যালেঞ্জ। সচেতনতা মূলক ছোট ভিডিও, রিল-সহজ, মজার, কিন্তু স্পষ্ট বার্তা।
- যারা ভালো কাজ করছে, তাদের সঙ্গে হাত মিলানো: স্থানীয় এনজিও, স্কাউট/রেডক্রিসেন্ট, পৌরসভার প্রকল্প-যেখানেই দেখো, অংশীদার হও। একই কাজ একসঙ্গে হলে গতি বহুগুণ বাড়ে।

উপসংহার

“আজ আমি” থেকে “আগামী আমরা”।

বর্জ্য সমস্যার সমাধান রকেট-বিজ্ঞান নয়-এটি প্রতিদিনের অভ্যাস, সামান্য শৃঙ্খলা, আর কিছু সৃজনশীলতার গল্প। তরুণরা যখন ৫R-কে নিজের জীবনে মানায়, পাড়ায় পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালায়, স্কুলে ক্লাব গড়ে, অ্যাপ/ফ্রপে হটস্পট রিপোর্ট করে, কম্পোস্ট-আপসাইক্লিং-স্টার্টআপে নামে-তখন শহর বদলাতে শুরু করে।

তাই তরুণদের বলছি-“নিজের আচরণের মাধ্যমে অন্যদের জন্য উদাহরণ তৈরি করো।” ছোট কাজ, নিয়মিত কাজ, ডেটাসহ কাজ-এই তিনে ভর করে তরুণদের হাতেই আমাদের শহর যাবে পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর আর গর্ব-করার মতো টেকসই পথে।

৪.২ বর্জ্য থেকে আয় করার সম্ভাব্য কৌশল

ভূমিকা:

বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তরিত করার উদ্যোগ, যেখানে পুনঃব্যবহার (reuse), পুনর্ব্যবহার (recycle) ও সৃজনশীল উদ্ভাবনের মাধ্যমে (repurpose) বর্জ্য থেকে আয় করা যায়। সঠিকভাবে আলাদা করা → সংগ্রহ → প্রক্রিয়াকরণ → বাজারে বিক্রি → এই চার ধাপ মেনে চললে বর্জ্যই হয়ে ওঠে আয়ের উৎস। আমাদের শহরগুলোতে প্রতিদিন প্রচুর বর্জ্য উৎপন্ন হয়। সঠিক ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগের মাধ্যমে এই ফেলনা জিনিসগুলোকেই অর্থ উপার্জনের সুযোগে বদলে দেওয়া সম্ভব। পরিবেশ রক্ষা এবং আয়ের উৎস দুটোই একসাথে অর্জন করার এটি একটি চমৎকার উপায়।

এক নজরে পদ্ধতি

উৎস (বাড়ি/দোকান/অফিস) → সোর্স সেগ্রিগেশন (জৈব/অজৈব/সংক্রামক) → স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ (ভ্যান/ভান্সারীওয়ালা) → চূড়ান্ত সেগ্রিগেশন → প্রক্রিয়াকরণ (উপাদান মিশ্রণ/ধোয়া/বেলিং/ক্রাশিং) → নতুন পণ্য উৎপাদন → ক্রেতা (কৃষক/রিসাইক্লার/অনলাইন ক্রেতা)।



বর্জ্য থেকে আয়ের কিছু উদাহরণ ও পদ্ধতি জৈব/পচনশীল বর্জ্য থেকে আয়

রান্নার বর্জ্য, কৃষি বর্জ্য, বাড়ীর আগাছা, লতা-পাতা, কচুরিপানা ইত্যাদি পচনশীল বর্জ্য থেকে কম্পোস্ট বা জৈব সার তৈরি করে বিক্রির মাধ্যমে আয় করা যায়। ঢাকার "Waste Concern" প্রতি দিন প্রায় ২০ টন আবর্জনা প্রক্রিয়াজাত করে জৈব সার বানিয়ে মুনাফা করছে। কিছু পদ্ধতি নিচে আলোচনা করা হলো-

গর্ত পদ্ধতি (Pit Method): ঐতিহ্যবাহী উপায়ে জৈব সার উৎপাদন

গর্ত পদ্ধতি হলো জৈব সার তৈরির একটি সহজ, কার্যকরী এবং ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতি। এটি বিশেষ করে গ্রামীণ পরিবেশে কৃষকদের জন্য উপযুক্ত, যেখানে সীমিত কাঠামো এবং কম খরচে উচ্চ পুষ্টিমানের কম্পোস্ট তৈরি করা সম্ভব।

১. গর্ত খনন ও কাঠামোগত প্রস্তুতি

ক. আদর্শ স্থান নির্বাচন:

- স্থান: গর্ত করার জন্য ছায়াযুক্ত ও উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে, যেখানে বৃষ্টির জল কোনোভাবেই জমবে না।
- গর্তের আকার:
 - * গর্তের গভীরতা হবে এক মিটার (১ মিটার)।
 - * দৈর্ঘ্য ও চওড়ার অনুপাত হবে প্রায় ২:১ (যেমন: ৩ মিটার লম্বা হলে ১.৫ মিটার চওড়া)।
 - * বর্জ্যের পরিমাণ বেশি হলে একটি বিশাল গর্ত না করে, একই মাপে একাধিক ছোট গর্ত খনন করা সুবিধাজনক। এতে পরিচর্যা করা সহজ হয়।

খ. দেয়াল ও তলদেশের ব্যবস্থাপনা:

- দেয়ালের প্রলেপ: খনন শেষ হলে গর্তের দেয়াল ও তলদেশ কাদা মাটি বা পাতলা গোবরের লেপ দিয়ে মসৃণ করে নিতে হবে। এটি দেয়ালকে রক্ষা করে এবং পার্শ্বীয় ক্ষতি কমাতে।
- ড্রেনেজ স্তর (Drainage Layer): গর্তের তলায় একটি পাতলা ড্রেনেজ স্তর তৈরি করতে হবে।
 - * উপাদান: চুনাপাথর, ইটের কুচি বা নুড়ি পাথরের উপর খড় বা শুকনা পাতা বিছিয়ে দিন।
 - * উদ্দেশ্য: এটি গর্তের মধ্যে পানি দাঁড়ানো রোধ করে এবং তলদেশ দিয়ে বায়ু চলাচল (Aeration) নিশ্চিত করে।

২. স্তরে স্তরে বর্জ্য ভরাট প্রক্রিয়া

গর্তটিকে সুনির্দিষ্ট অনুপাতে জৈব বর্জ্য দিয়ে ভরাট করতে হবে।

স্তর (প্রকৃতি)	উপাদানসমূহ	আনুপাতিক গুরুত্ব	উদ্দেশ্য
সবুজ স্তর (Nitrogen Rich)	রান্নার বর্জ্য, কৃষি বর্জ্য, আগাছা, লতা-পাতা, কলা গাছের অংশ, কচুরিপানা (সব কুচি কুচি করে কাটা)	১ অংশ	দ্রুত পঁচনের জন্য প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন সরবরাহ করে
বাদামী স্তর (Carbon Rich)	শুকনা পাতা, খড়/তুষ (ভুষি), কাঠ বা কাঠের গুঁড়ো, ছাই	১.৫ অংশ	বর্জ্যের কার্বন সরবরাহ করে, দুর্গন্ধ কমায় এবং পঁচন প্রক্রিয়াকে সুমম করে

- **আদর্শ অনুপাত:** সবুজ বর্জ্যের তুলনায় বাদামী বর্জ্যের পরিমাণ কিছুটা বেশি রাখা (আনুমানিক কার্বন:নাইট্রোজেন অনুপাত ১.৫:১ বা ২৫-৩০:১) হলে দুর্গন্ধ কমে এবং পচন দ্রুত হয়।
- **ইনোকুলাম (Starter):** প্রতিটি স্তরের শেষে এক মুঠো মাটি বা পুরনো কম্পোস্ট ছিটিয়ে দিন। এতে উপকারী জীবাণু (Microbes) দ্রুত কাজ শুরু করতে পারে।
- **গোবর ও নাইট্রোজেন:**
 - * যদি তাজা গোবর যোগ করা হয়, তবে তা পাতলা করে ছড়িয়ে দিতে হবে।
 - * এর উপরে পাতলা করে মাটি বা শুকনা স্তর দেওয়া উচিত। এটি পচনকালে সৃষ্ট মিথেন উড়ে যাওয়া রোধ করে, নাইট্রোজেনের ক্ষয় কমায় এবং সারের গুণাগুণ ঠিক রাখে।
- **গর্ত ভরাট:** গর্তটি পুরোপুরি ভরে দিতে হবে।

৩. আর্দ্রতা ও তাপমাত্রার পরিচর্যা

- **আর্দ্রতা:** ভেতরের আর্দ্রতা "ভেজা স্পঞ্জের" মতো রাখতে হবে: বর্জ্য চেপে ধরলে স্যাঁতসেঁতে লাগবে, কিন্তু কোনো পানি বরবে না।
 - * বেশি আর্দ্র হলে: বাদামী উপাদান (শুকনা খড়/কাঠের গুঁড়ো) বাড়িয়ে দিন।
 - * বেশি শুষ্ক হলে: সামান্য পানি, গরুর মূত্র, খৈল ভেজানো পানি, অথবা ফসফেটের হালকা দ্রবণ ছিটিয়ে আর্দ্রতা বজায় রাখুন।
- **পচন ত্বরান্বিতকরণ (ঐচ্ছিক):** পচন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে প্রতি ১০০ কেজি কম্পোস্টে আনুমানিক ২ কেজি টিএসপি সমমানের ফসফেট (যেমন রক ফসফেট বা হাড়গুঁড়ো) হালকা দ্রবণ আকারে ছিটিয়ে দেওয়া যেতে পারে।
- **বায়ু সরবরাহ (Turning):**
 - * নিয়মিত (প্রতি ৭-১০ দিনে একবার) কম্পোস্টটি ভালোভাবে নেড়ে দিতে হবে।
 - * **উদ্দেশ্য:** নেড়ে দিলে ভেতরে অক্সিজেন প্রবেশ করে (বায়বীয় পচন), তাপমাত্রা ৫০°C-৬০°C পর্যন্ত বাড়ে। এই উচ্চ তাপমাত্রা রোগজীবাণু এবং আগাছার বীজকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়।



৪. পরিপক্বতা, সংগ্রহ ও প্রয়োগ

- **পচন সমাপ্তি:** নিয়ম মেনে চললে ৫০-৬০ দিনের মধ্যে সক্রিয় পচন প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যায়। এরপর আরও ২-৩ সপ্তাহ কিউরিং (Curing) এর জন্য রেখে দিন।
- **সার সংগ্রহ:** প্রায় ৯০ দিনের মাথায় কম্পোস্টটি গর্ত থেকে তুলে ছায়াযুক্ত স্থানে ভালোভাবে শুকিয়ে নিন।
- **মান উন্নয়ন:** শুকানো কম্পোস্টকে চূর্ণ করে ছাঁকনি দিয়ে চেলে নিলে উৎকৃষ্ট মানের দানাদার সার পাওয়া যায়।
- **সারের গুণাগুণ:** প্রস্তুত কম্পোস্ট হবে গাঢ় বাদামী-কালো রঙের এবং মাটির মতো সুগন্ধযুক্ত।
- **নিষেধাজ্ঞা:** প্লাস্টিক, ধাতু, কাঁচ, তেল/চর্বি, মাংস/দুধজাত পণ্য, বা রোগাক্রান্ত গাছের অংশ কখনোই গর্তে দেবেন না।
- **নিরাপত্তা:** কম্পোস্টিং কাজ করার সময় গ্লাভস, বুট ও মাস্ক ব্যবহার করা নিরাপদ।
- **প্রয়োগ:** জমিতে প্রতি বর্গমিটারে ১-২ কেজি অথবা টব বা বাগানের মাটিতে মোট উপাদানের ২০-৩০% ভার্মিকম্পোস্ট মিশিয়ে দিন। এটি মাটিকে নরম করে, পানি ধারণক্ষমতা ও উর্বরতা উভয়ই বাড়ায়।

হিপ পদ্ধতি (Heap Method): স্বল্প খরচে উৎকৃষ্ট মানের জৈব সার উৎপাদন

হিপ পদ্ধতি হলো কম্পোস্ট তৈরির সবচেয়ে সহজ, কম খরচের এবং দ্রুততম একটি প্রক্রিয়া। এটি কার্যকরভাবে জৈব বর্জ্যকে উচ্চ পুষ্টিমানের সারে রূপান্তর করে। অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় কম সময়ে এই সার তৈরি করা যায়, যা গ্রামীণ বা সীমিত সম্পদের পরিবেশে অত্যন্ত উপযোগী।

১. হিপ তৈরির আদর্শ কাঠামো ও স্থান

- **স্থান নির্বাচন:** বর্জ্য স্তুপ করার জন্য খোলা, উঁচু এবং জল জমা হয় না এমন স্থান নির্বাচন করতে হবে।
- **আশ্রয়:** সরাসরি রোদ ও বৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য উপরে অবশ্যই একটি শেড (ছাউনি) থাকতে হবে।
- **স্তর এবং আকৃতি:**
 - * হিপের আদর্শ দৈর্ঘ্য প্রায় ১০ ফুট এবং চওড়া ৩ থেকে ৪ ফুট হওয়া উচিত। উচ্চতাও সাধারণত ৩-৪ ফুট রাখা হয়।
 - * সম্পূর্ণ হিপের আকৃতি দেখতে অনেকটা কবরের মতো বা অর্ধ-বৃত্তাকার হওয়া বাঞ্ছনীয়, যাতে পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল কমে তাপ কম নির্গত হয়।
- **তলদেশের প্রস্তুতি:**
 - * প্রথমে মাটিতে একটি মোটা কালো পলিথিন বিছিয়ে দিতে হবে।
 - * পলিথিন যাতে সারের সংস্পর্শে না আসে, সেজন্য পলিথিনের উপর খড়, বিচালি, ঘাস বা অন্য যেকোনো জৈব বস্তুর একটি অতিরিক্ত স্তর তৈরি করা যেতে পারে। এটি সারের মান বজায় রাখতে সাহায্য করবে।

প্রতি ১০০ কেজি বর্জ্যের উপর ২০০ গ্রাম রক ফসফেট বা TSP পানি ছিটিয়ে দিতে হবে

প্রতি ১০০ কেজি বর্জ্যের উপর ০.৫ কেজি চুন ছিটিয়ে পানির ছিটা দিতে হবে

প্রতি ১০০ কেজি বর্জ্যের সহিত ১০ কেজি গোবর ও ১ কেজি কাঠের গুড়া মিশিয়ে নিতে হবে

১ ইঞ্চি বুরবুরে দোঁয়াশ মাটি ছিটিতে হবে

উপরেও মোটা কালো পলিথিন



নিচে মোটা কালো পলিথিন



২. ধাপে ধাপে বর্জ্য মিশ্রণ (স্তর বিন্যাস)

এই পদ্ধতিতে বর্জ্য ও অন্যান্য উপাদানগুলো ডানদিকে বর্ণিত স্তর অনুসারে, কিন্তু বিপরীত ক্রমে, স্তরে স্তরে সাজাতে হবে। একটি হিপে এই বর্ণিত স্তরগুলোর ৩ থেকে ৪ বার পুনরাবৃত্তি করা ভালো।

উপাদান ও আনুপাতিক হার	উদ্দেশ্য ও প্রয়োগের নিয়ম
জৈব বর্জ্য (প্রধান স্তর)	কম্পোস্টিং উপাদান: ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করে কাটা ফল, সবজি ও ফসলের অবশিষ্টাংশ
গোবর ও কাঠের গুড়া	পচন অনুঘটক: প্রতি ১০০ কেজি বর্জ্যের সাথে ১০ কেজি গোবর (অণুজীবের উৎস) এবং ১ কেজি কাঠের গুড়া (কার্বনের উৎস) ভালোভাবে মিশিয়ে দিন
চুন (Lime)	অম্লত্ব নিয়ন্ত্রণ: প্রতি ১০০ কেজি বর্জ্যের উপর ০.৫ কেজি চুন ছিটিয়ে দিন। চুন পচনকালে সৃষ্ট অম্লত্ব (Acidity) নিয়ন্ত্রণ করে পচন প্রক্রিয়াকে স্বাভাবিক রাখে।
ফসফেট সার (TSP/রক ফসফেট)	পুষ্টি সংযোজন: প্রতি ১০০ কেজি বর্জ্যের উপর ২০০ গ্রাম রক ফসফেট বা টিএসপি (Triple Super Phosphate) ছিটিয়ে দিন। এটি সারে ফসফরাসের পরিমাণ বাড়ায়
দোঁয়াশ মাটি	বায়ু প্রবাহ ও পুষ্টি ধরে রাখা: উপরে ১ ইঞ্চি পুরু বুরবুরে দোঁয়াশ মাটি ছিটিয়ে দিতে হবে

৩. বিশেষ পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনা

হিপ পদ্ধতির সাফল্যের জন্য পরিচর্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

- **প্রথম উল্টিয়ে দেওয়া :** পচন প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য, হিপ তৈরি করার ২৪ ঘণ্টা পর প্রথমবার উল্টিয়ে দিন। এটি বায়বীয় পচনের (Aerobic Decomposition) জন্য অত্যাবশ্যক।
- **পরবর্তী উল্টানো:** এরপর ৪৮ ঘণ্টা পর দ্বিতীয়বার এবং ৭২ ঘণ্টা পর তৃতীয়বার উল্টিয়ে দিন।
- **সাপ্তাহিক উল্টানো:** প্রথম তিন দিনের পর, পচন প্রক্রিয়া বজায় রাখতে সপ্তাহে কমপক্ষে ১ বার ভালোভাবে উল্টিয়ে দিতে হবে।
- **ছাঁই মিশ্রণ (এক্সিক):** ১ বা ২ বার উল্টানোর পর বর্জ্যের ১০% সমপরিমাণ ছাঁই (কাঠ বা চাতালের ছাঁই) ভালোভাবে মিশিয়ে দিলে পটাশিয়ামের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং ফলাফল ভালো হয়।
- **অর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ:** হিপ শুকিয়ে গেলে মাঝে মাঝে পানির ছিটা দিন। অতিরিক্ত পানি দেওয়া যাবে না, এতে বায়ু চলাচল বন্ধ হয় পচন প্রক্রিয়া ধীর হয়ে যেতে পারে।

■ ঢাকনা ও পলিথিন সতর্কতা:

- * হিপটিকে খড়-কুটা, লতা-পাতা বা অন্য যেকোনো জৈব পদার্থ দিয়ে ভালো করে ঢেকে দিতে হবে।
- * পরামর্শ: কেবল জৈব পদার্থের স্তরের উপর কালো পলিথিন ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে সরাসরি বর্জ্যের সংস্পর্শে পলিথিন ব্যবহার এড়িয়ে চলুন। কারণ তাপের সংস্পর্শে পলিথিন থেকে মাইক্রোপ্লাস্টিক ছড়াতে পারে।

৪. পরিপক্বতা এবং বাজারজাতকরণ

- সার প্রস্তুতি: সাধারণত, ৩০ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যেই হিপ পদ্ধতিতে উৎকৃষ্ট মানের জৈব সার তৈরি হয়ে যায়।
- চূড়ান্ত প্রক্রিয়াকরণ: তৈরি হয়ে যাওয়া সারকে চেম্বার থেকে বের করে ছায়াযুক্ত স্থানে ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে।
- মান উন্নয়ন: শুকানো সারকে চূর্ণ করে ছোট ছিদ্রযুক্ত ছাঁকনি বা চালনি দিয়ে ছেঁকে (Sieving) প্যাকেটজাত করতে হবে।
- মূল্য: সঠিকভাবে প্রস্তুতকৃত ও প্যাকেটজাত জৈব সার বাজারে ভালো মূল্যে (প্রিমিয়াম রেট) বিক্রি করা সম্ভব।

বক্স/চেম্বার পদ্ধতিতে জৈব সার উৎপাদন

বক্স বা চেম্বার পদ্ধতিতে জৈব সার উৎপাদন হলো নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বর্জ্যকে দ্রুত এবং কার্যকরভাবে কম্পোস্টে রূপান্তরের একটি উন্নত প্রক্রিয়া। এই পদ্ধতিতে সারের পুষ্টিমান সর্বোচ্চ পর্যায়ে বজায় রাখা সম্ভব হয়।

১. কম্পোস্টিং কাঠামোর নকশা ও ব্যবস্থাপনা

এই পদ্ধতির সাফল্যের জন্য একটি সুচিন্তিত কাঠামো অপরিহার্য।

- কাঠামো নির্মাণ: কম্পোস্টিং চেম্বারগুলি সাধারণত টিন, ফাইবার শীট, ইট বা সিমেন্টের বক্স ব্যবহার করে তৈরি করা হয়। চেম্বারগুলো সুবিধামত স্কেয়ার (বর্গাকার) বা আয়তাকার হতে পারে।

- বায়ু চলাচল (Ventilation): চেম্বারের ভেতরে ছিদ্রযুক্ত PVC পাইপ স্থাপন করা জরুরী। এই পাইপগুলো:

- * বায়ু চলাচলের সুবিধা দেয় (Aeration)।
- * পচন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট ভেতরের গ্যাস (বিশেষত

কার্বন ডাই-অক্সাইড) নিঃসরণে সাহায্য করে।

- * এর ফলে অক্সিজেনের সরবরাহ নিশ্চিত হয়, যা কম্পোস্টের পুষ্টিমান বজায় রাখা এবং দ্রুত পচনের জন্য অত্যাবশ্যক।

- লিচেট সংগ্রহ (Leachate Management):

- * চেম্বারের চারপাশে একটি ঢালু নালা বা বেসিন থাকতে হবে। পচন প্রক্রিয়া চলাকালীন বর্জ্য থেকে নির্গত অতিরিক্ত জলীয় পদার্থ বা লিচেট এই নালা দিয়ে বেরিয়ে এসে একটি সংগ্রহ পাত্রে জমা হয়।

- * পুষ্টি পুনর্ব্যবহার: সংগৃহীত লিচেট আবার বর্জ্যের উপর ছিটিয়ে দিলে বর্জ্য হালকা আদ্র থাকে। এতে পচন প্রক্রিয়া দ্রুত হয় এবং লিচেটে থাকা পুষ্টি উপাদান পুনরায় বর্জ্যের মধ্যে ফিরে যাওয়ায় সারের পুষ্টিমান বৃদ্ধি পায়।

- আশ্রয় প্রদান: সকল চেম্বারকে সরাসরি রোদ ও বৃষ্টি থেকে সুরক্ষিত রাখতে একটি শেডের নিচে বা ছায়াযুক্ত স্থানে স্থাপন করতে হবে।



২. ধাপে ধাপে সার তৈরির প্রক্রিয়া

চেম্বার পদ্ধতিতে সার তৈরির প্রক্রিয়াকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপে ভাগ করা যায়:

ধাপ ১: বর্জ্য পৃথকীকরণ ও প্রস্তুতি

- **পৃথকীকরণ:** সংগৃহীত জৈব বর্জ্যকে সম্পূর্ণরূপে প্লাস্টিক, কাঁচ, ধাতু বা অন্যান্য অ-পচনশীল বর্জ্য থেকে আলাদা করতে হবে।
- **স্তর তৈরি:** পৃথক করা জৈব বর্জ্যগুলোকে একটি পরিষ্কার স্থানে প্রথমে সর্বোচ্চ ১২ ইঞ্চি (প্রায় ৩০ সেমি) পরু করে বিছিয়ে দিতে হবে।

ধাপ ২: ইনোকুলাম ও পুষ্টি উপাদান মিশ্রণ

- **গোবর গোলা জল:** বিছানো বর্জ্যের উপর গোবর গোলা পানি ছিটিয়ে দিতে হবে। সাধারণ অনুপাত হলো: প্রতি ৩০০০ কেজি বর্জ্যের জন্য কমপক্ষে ১০০ কেজি গোবর। গোবর ইনোকুলাম (উপকারী অণুজীব) হিসেবে কাজ করে।
- **কাঠের গুঁড়া:** এরপর এর উপর কাঠের গুঁড়া ছিটিয়ে দিন। ৩০০০ কেজি বর্জ্যের জন্য ১০-২০ কেজি কাঠের গুঁড়া যথেষ্ট। কাঠের গুঁড়া কার্বন উৎস হিসেবে কাজ করে এবং কম্পোস্টের কাঠামো হালকা রাখে।



ধাপ ৩: আর্দ্রতা ও অনুঘটক যোগ

- **লিচেট ব্যবহার:** যদি লিচেট পাওয়া যায়, তা এমন পরিমাণে দিতে হবে যাতে বর্জ্যগুলো হালকা ভেজা ভেজা হয়। সতর্কতা: বর্জ্য যেন কখনোই কাদা কাদা না হয়ে যায়। অতিরিক্ত আর্দ্রতা সৃষ্টি হলে পচন প্রক্রিয়া অ্যানারোবিক (অক্সিজেনবিহীন) হয়ে ধীর গতিতে সম্পন্ন হবে এবং দুর্গন্ধ সৃষ্টি হবে।
- **ইউরিয়া ব্যবহার (বিকল্প):** লিচেট না থাকলে, পচন প্রক্রিয়া দ্রুত করতে ইউরিয়া গোলা পানি ব্যবহার করা যেতে পারে (প্রতি ৩০০০ কেজিতে ২-৫ কেজি ইউরিয়া)।

ধাপ ৪: মিশ্রণ ও চেম্বারে স্থাপন

- **সম্পূর্ণ মিশ্রণ:** বর্জ্যগুলোর একটি কোণ থেকে শুরু করে কোদাল ব্যবহার করে পুরো স্তুপটি ভালোভাবে মিশ্রিত করতে হবে (যেমন সিমেন্ট-খোয়া মেশানো হয়)।
- **স্থাপন:** মিশ্রণের কাজটি শেষ করে একই দিনে সব বর্জ্য চেম্বারে স্থানান্তর করতে হবে।

ধাপ ৫: পরিচর্যা ও পর্যবেক্ষণ

- **তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা পরীক্ষা:** নিয়মিতভাবে চেম্বারের ভেতরের তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা পরীক্ষা করতে হবে। তাপমাত্রা সাধারণত ৩৫°C থেকে ৭০°C পর্যন্ত হতে পারে।
- **আর্দ্রতা বজায় রাখা:** বর্জ্য শুকিয়ে গেলে লিচেট বা সামান্য পানি ছিটিয়ে দিতে হবে।
- **উল্টানো (Turning):**
 - * যদি চেম্বারের ভেতরে হিদ্‌যুক্ত পাইপ বা বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা না থাকে, তবে পচন প্রক্রিয়াকে সচল রাখতে প্রতি ৭ দিন অন্তর বর্জ্যগুলোকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দিতে হবে।
 - * পচনের সমাপ্তি: প্রায় ৩০ দিন পর চেম্বারের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করবে। ৪৫ দিন পর তাপমাত্রা যখন পরিবেশের তাপমাত্রার কাছাকাছি স্থির হয়ে যাবে, তখন বুঝতে হবে পচন প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়েছে।

ধাপ ৬: চূড়ান্ত প্রক্রিয়াকরণ ও মোড়কজাতকরণ

- **শুকানো ও চূর্ণ করা:** পচন শেষ হওয়ার পর বর্জ্যগুলোকে চেম্বার থেকে বের করে ছায়ায় শুকানো স্থানে ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে এবং তারপর চূর্ণ করে নিলেই উৎকৃষ্ট মানের জৈব সার পাওয়া যাবে।
- **মান উন্নয়ন:** সারের মান আরও উন্নত করতে ছোট হিদ্‌যুক্ত চালনি বা জালের মাধ্যমে ছেঁকে নিতে হবে। এরপর প্রস্তুতকৃত এই সার প্যাকেটজাত করার জন্য প্রস্তুত।



ভার্মিকম্পোস্ট তৈরির পদ্ধতি

কেঁচো সার (ভার্মিকম্পোস্ট) উৎপাদন: পদ্ধতি ও প্রয়োগ

ভার্মিকম্পোস্ট, যা জনপ্রিয়ভাবে "কেঁচো সার" নামে পরিচিত, এটি হলো এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরি জৈব সার। এটি পৃথিবীর কিছু নির্দিষ্ট প্রজাতির কেঁচোর মাধ্যমে জৈব বর্জ্যকে বিয়োজিত করে তৈরি করা হয়। পরিবেশবান্ধব ও পুষ্টিসমৃদ্ধ এই সার আধুনিক কৃষিতে মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় এক বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করছে।

১. ভার্মিকম্পোস্ট তৈরির কাঠামো ও উপকরণ

ক. আদর্শ স্থান ও কাঠামো:

- স্থান নির্বাচন: ভার্মিকম্পোস্ট তৈরির জন্য ছায়াযুক্ত, বায়ু চলাচলকারী এবং বৃষ্টির জল জমবে না এমন উঁচু স্থান নির্বাচন করতে হবে।
- চৌবাচ্চা (বেড) নির্মাণ:
 - * উপাদান: স্থায়ী কাঠামোর জন্য ইট/মাটি/সিমেন্টের খুঁটি ব্যবহার করা যেতে পারে। অস্থায়ী বা ছোট আকারের উৎপাদনের জন্য মাটির চাড়ি, কাঠের বাক্স বা সিমেন্টের রিং ব্যবহার করা যেতে পারে।
 - * পরিমাপ: আদর্শ চৌবাচ্চার চওড়া প্রায় ১ মিটার, লম্বা ১ থেকে ৩ মিটার এবং গভীরতা ৩০ থেকে ৪৫ সেন্টিমিটার (কম গভীরতা কেঁচোর চলাচলের জন্য সুবিধাজনক)।
 - * ফ্লোর: মেঝে অবশ্যই পাকা বা সিমেন্টের হতে হবে যেন কেঁচো মাটির গভীরে চলে যেতে না পারে।



খ. প্রাথমিক উপকরণ (বেডিং ম্যাটেরিয়াল):

- তলদেশ: চৌবাচ্চার একদম নিচে শুকনা পাতা, খড়, বা নারিকেলের ছোবড়ার একটি পাতলা স্তর (৩-৫ সেমি পুরু) দিতে হবে। এটি কেঁচোদের থাকার জায়গা তৈরি করবে এবং অতিরিক্ত আর্দ্রতা শোষণ করবে।
- খাদ্য উপাদান (ফিডস্টক):
 - * গোবর: ১৫-৩০ দিন আগে সামান্য পচানো বা অর্ধ-পচানো গরুর গোবর প্রধান খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
 - * সহায়ক বর্জ্য: এর সাথে কুচি করা রান্নাঘরের বর্জ্য (শাকসবজি ও ফলের উচ্ছিষ্ট), নরম আগাছা, লতাপাতা এবং কলাগাছের নরম অংশ মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

২. কেঁচো নির্বাচন ও স্থাপন

ক. কেঁচো নির্বাচন:

- ভার্মিকম্পোস্ট তৈরির জন্য প্রধানত আইসেনিয়া ফেটিডা (*Eisenia fetida*) বা আফ্রিকান নাইট ক্রলার (*Eudrilus eugeniae*) জাতীয় দ্রুত বংশবৃদ্ধি এবং উচ্চ বর্জ্য বিয়োজন ক্ষমতা সম্পন্ন কেঁচো ব্যবহার করা হয়।
- কেঁচোর পরিমাণ: প্রতি ১ কেজি গোবরে বা বর্জ্যে সাধারণত ১০০ থেকে ২৫০টি সুস্থ ও ভালো জাতের কেঁচো ছাড়তে হবে।

খ. স্থাপন প্রক্রিয়া:

- চেষ্টার বা চৌবাচ্চার সর্বোচ্চ তিন-চতুর্থাংশ (৩/৪ অংশ) পর্যন্ত প্রস্তুতকৃত বর্জ্য দ্বারা পূর্ণ করতে হবে, যাতে কেঁচোরা আরামদায়কভাবে চলাচল ও খাবার গ্রহণ করতে পারে।
- প্রথম কয়েকদিন কেঁচোদের পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে সময় দিতে হবে।

৩. বিশেষ সতর্কতা ও ব্যবস্থাপনা (রক্ষণাবেক্ষণ)

ব্যবস্থাপনা দিক	করণীয় (বিস্তারিত)
আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ	মাঝে মাঝে পরীক্ষা: বর্জ্যের আর্দ্রতা ৪০-৫০% বজায় রাখতে হবে। শুকিয়ে গেলে পরিষ্কার পানি সামান্য ছিটিয়ে দিন। অতিরিক্ত পানি যেন না জমে (জলাবদ্ধতা মারাত্মক)
আলো ও তাপমাত্রা	ছাউনি: সরাসরি রোদ, অতিরিক্ত বৃষ্টি এবং পাখিদের আক্রমণ থেকে বাঁচতে উপরে ছাউনি (টিন বা ছন) দিতে হবে। তাপমাত্রা যেন ২০-৩০° সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে
ঢাকনা ব্যবহার	চেষ্টারের উপর ভেজা পাটের বস্তা বা মোটা পাতার ঢাকনা দিন। এটি আর্দ্রতা ধরে রাখবে এবং আলো কমিয়ে কেঁচোদের কার্যকলাপ বাড়াবে
শত্রু নিবারণ	পিঁপড়া: পিঁপড়ার আক্রমণ থেকে বাঁচতে চৌবাচ্চার চারিদিকে পানির নালা তৈরি করুন বা নালার পাশে পিঁপড়া মারার অর্গানিক ওষুধ ব্যবহার করুন। ইঁদুর ও পাখির আক্রমণ থেকে সাবধান থাকুন
নিষিদ্ধ খাদ্য	কঠোরভাবে বর্জনীয়: প্লাস্টিক, কাঁচ, ধাতু, লবণ, তেল, চর্বিযুক্ত খাবার, মাংস ও দুধজাত দ্রব্য, টক জাতীয় খাবার বা রোগাক্রান্ত গাছের অংশ কখনোই দেওয়া যাবে না

৪. সার সংগ্রহ ও পরিপক্বতা

- **সংকেত:** সাধারণত, ৪০ থেকে ৬০ দিন পর কেঁচো সার প্রস্তুত হয়। সার প্রস্তুত হলে এটি গাঢ় বাদামি, দানাদার, মাটির মতো গন্ধযুক্ত হবে এবং হাত দিয়ে ধরে গুঁড়ো করলে তা ঝুরঝুর করে ঝরে পড়বে (হাতে লেগে থাকবে না)।
- **সংগ্রহ প্রক্রিয়া:** সার প্রস্তুত হওয়ার ১০-১৫ দিন আগে বর্জ্য দেওয়া বন্ধ করতে হবে। সার প্রস্তুত হয়ে গেলে, কেঁচোগুলোকে নতুন বেডে সরিয়ে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, অন্যথায় কেঁচো মারা যেতে পারে।
- **পৃথকীকরণ:** সার সংগ্রহের সময় খুব সাবধানে কাজ করতে হবে। মসৃণ চালনি বা জাল ব্যবহার করে সার চেলে নিন, যেন কেঁচোর গায়ে কোনো আঘাত না লাগে। আঘাত লাগলে কেঁচো মারা যেতে পারে।
- **উৎপাদনের পরিমাণ:** খাদ্যের মোট ওজনের প্রায় ৩০-৪০% পরিমাণ কম্পোস্ট সার পাওয়া যায়।

৫. বাজারজাতকরণ ও সহায়তা

বর্তমানে বাজারে ভার্মিকম্পোস্ট সারের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। গুণগত মানের ভিত্তিতে প্রতি কেজি সার ১৫-৪০ টাকা বা তার বেশি দামে বিক্রি হতে পারে। জৈব সার উৎপাদক হিসেবে আপনি যদি কৃষি কর্মকর্তাদের সহযোগিতা নেন, তবে তারা সারের মান নিয়ন্ত্রণ, প্রয়োজনীয় সনদ গ্রহণ, প্রচার-প্রচারণা এবং স্থানীয় বা বৃহত্তর পরিসরে বিক্রয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।

ট্রাইকো-কম্পোস্ট

ট্রাইকো-কম্পোস্ট হলো জৈব সার, যেখানে সাধারণ কম্পোস্টের সঙ্গে *Trichoderma* spp. (বিশেষ করে *Trichoderma harzianum*, *T. viride* ইত্যাদি) নামের উপকারী ছত্রাক ব্যবহার করা হয়। এই ছত্রাক মাটির ক্ষতিকর ছত্রাককে দমিয়ে রাখে এবং একই সঙ্গে জৈব উপাদান দ্রুত পচিয়ে গাছের জন্য সহজলভ্য পুষ্টিতে রূপান্তর করে।

ট্রাইকো-কম্পোস্টের সুবিধা:

- রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার কমায়
- মাটির জৈব পদার্থ, গঠন ও জলধারণ ক্ষমতা বাড়ায়
- শিকড় পঁচা, কান্ড পঁচা, উইল্ট ইত্যাদি মাটিবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে
- সবজি, ধান, ফল, ফুল-প্রায় সব ফসলে ব্যবহারযোগ্য

কাঁচামাল (Ingredients)

বাংলাদেশের গ্রামীণ বাস্তবতায় সহজলভ্য উপাদান দিয়ে ট্রাইকো-কম্পোস্ট বানানো যায়। উদাহরণ হিসেবে ১ টন (প্রায়) ট্রাইকো-কম্পোস্টের জন্য উপকরণ:

- গোবর (গরুর/গাভীর) - ৩০০-৩৫০ কেজি
- ফসলের আবর্জনা/শুকনা পাতা/খড় - ৩৫০-৪০০ কেজি
- কাটা কচি সবুজ ঘাস বা ডালজাতীয় গাছের পাতা - ১৫০-২০০ কেজি
- কুচানো কচি শিকড়সহ আগাছা - প্রয়োজনমতো (ইচ্ছে করলে বাদও দেওয়া যায়)
- ছাই (খড়ি, লাকড়ি বা গৃহস্থালির) - ২০-২৫ কেজি
- মাটি (বাগানের বা আবাদি জমির ওপরের অংশের) - ৮০ - ১০০ কেজি

- চূর্ণ ভূসি/গমের ভূষি/ধানের কুড়া - ২০-৩০ কেজি
- ট্রাইকোডার্মা কালচার
 - Trichoderma sp. ট্যাক/পাউডার ফরমুলেশন - ১-২ কেজি
 - অথবা তরল (liquid) ফরমুলেশন - প্রস্তুতকারকের নির্দেশনা অনুযায়ী
- গুড় বা চিনি - ৩-৫ কেজি (ট্রাইকোডার্মা সক্রিয় করার জন্য)
- পরিকার পানি - প্রয়োজনমতো (কম্পোস্টের আর্দ্রতা ৬০-৭০% রাখার জন্য)

বিঃ দ্রঃ বাস্তবে উপকরণের অনুপাত কিছুটা কমবেশি হতে পারে; মূল লক্ষ্য হচ্ছে কার্বন সমৃদ্ধ উপাদান (খড়, পাতা) ও নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ উপাদান (গোবর, সবুজ ঘাস) এর ব্যালান্স রাখা।

জায়গা নির্বাচন ও গর্ত/ট্যাংক প্রস্তুতি

সাধারণত দুইভাবে ট্রাইকো-কম্পোস্ট বানানো হয়:

১. মাটির গর্ত পদ্ধতি
২. কংক্রিট/রিং স্লাব ট্যাংক পদ্ধতি

জায়গা নির্বাচন:

- বাড়ির আঙিনা বা খামারের উঁচু জায়গা, যাতে পানি জমে না
- সরাসরি রোদ ও প্রবল বৃষ্টির আঘাত যেন না পড়ে (টিনের ছাউনির নিচে বা ঘরের পাশে হলে ভালো)
- জলাবদ্ধতা ও গবাদি পশুর চলাচল থেকে নিরাপদ

গর্তের মাপ (মাটির):

- দৈর্ঘ্য: ২.৪-৩.০ মিটার
- প্রস্থ: ১.২-১.৫ মিটার
- গভীরতা: ০.৯-১.০ মিটার

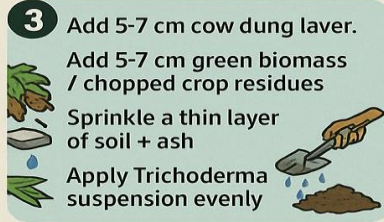
HOW TO PREPARE TRICHO-COMPOST - STEP BY STEP



Prepare a pit or concrete tank in a shaded, well-drained place (approx. 3m x 1.5m x 1m). Line



Make a 5-8 cm thick base layer with dry straw or coarse crop residues. Moisten slightly

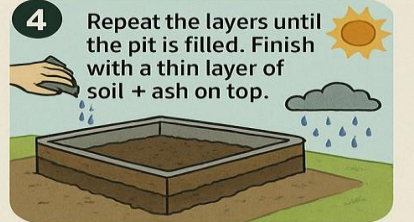


3 Add 5-7 cm cow dung layer.

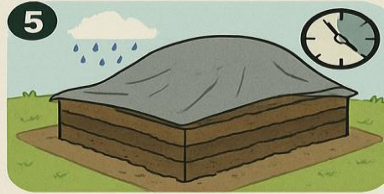
Add 5-7 cm green biomass / chopped crop residues

Sprinkle a thin layer of soil + ash

Apply Trichoderma suspension evenly



4 Repeat the layers until the pit is filled. Finish with a thin layer of soil + ash on top.



Cover with old jute sacks or plastic sheet. Protect from heavy rain and direct sun



Compost matures in 45-60 days.

গর্তের তল ও দেয়ালে প্লাস্টিক/তর্পলিন বিছিয়ে নিলে পানি শোষণ/ভিজ়ে যাওয়া অনেক কম হয়।

ট্রাইকোডার্মা স্টার্টার বা সাসপেনশন তৈরি

বাজার থেকে Trichoderma sp. এর ট্যাক/পাউডার ফরমুলেশন ক্রয় করার পর-ধাপ:

- পরিকার বালতি বা ড্রামে ১০-২০ লিটার পানি নিন।
- তাতে ৩-৫ কেজি গুড় (বা চিনি) গুলে নিন।
- এরপর ১-২ কেজি Trichoderma পাউডার ভালোভাবে মিশিয়ে দিন।
- মিশ্রণটি ১২-২৪ ঘন্টা ছায়াযুক্ত স্থানে রেখে দাও (ঢিলা করে ঢাকনা দেবেন, যেন বায়ু চলাচল থাকে)।

এতে একটি সক্রিয় Trichoderma সাসপেনশন/স্টার্টার সল্যুশন তৈরি হবে, যা বিভিন্ন স্তরের উপরে ছিটিয়ে দেওয়া হবে।

স্তর করে ট্রাইকো-কম্পোস্ট তৈরি পদ্ধতি (Layering Method)

এখন আসি মূল প্রক্রিয়ায়। এখানে একটি স্ট্যান্ডার্ড প্রক্রিয়া তুলে ধরা হলো, যা বাংলাদেশে গবেষণা ও মাঠ পর্যায়ে বহুল ব্যবহৃত।

ধাপ-১: তল প্রস্তুতি (Base Layer)

- গর্ত/ট্যাংকের তলায় ৫-৮ সেমি পুরু শুকনা খড় বা মোটা ডাঁটা বিছিয়ে নিন।
- এর ওপর হালকা করে পানি ছিটিয়ে ভিজিয়ে দিন (ভেজা কিন্তু বারবারে)

ধাপ-২: প্রথম স্তর

- গোবর স্তর- ৫-৭ সেমি পুরু করে গোবর বিছান।
- ফসলের আবর্জনা/পাতা স্তর - তার উপর ৫-৭ সেমি কুচানো পাতা/আবর্জনা ছড়ান।
- মাটি ও ছাই স্তর - পাতার উপর পাতলা করে (১-২ সেমি) মাটি+ছাই মিশ্রণ দিন।
- ট্রাইকোডার্মা সাসপেনশন - উপর থেকে ঝাঁঝরি/মগ দিয়ে Trichoderma সাসপেনশন ভালোভাবে ছিটিয়ে দিন।
- আর্দ্রতা পরীক্ষা: মুঠোয় ধরে চেপে ধরলে পানির ফোঁটা না পড়লেও বলের মতো ধরতে পারা যাবে-এই অবস্থাই আদর্শ।

ধাপ-৩: পরবর্তী স্তরগুলো

- উপরের ধাপগুলোই (গোবর → আবর্জনা/ঘাস → মাটি+ছাই → Trichoderma সাসপেনশন) বারবার করে স্তর দিয়ে যেতে হবে।
- প্রতিটি স্তরের পুরুত্ব ১০-১৫ সেমি রাখাই উত্তম।
- গর্ত/ট্যাংক পূর্ণ হলে উপরে আবার মাটি ও ছাইয়ের পাতলা স্তর দিয়ে ঢেকে দিন।

ধাপ-৪: গর্ত/ট্যাংক বন্ধ করা

- সবশেষে গর্তের মুখে পুরনো সারি জুটের বস্তা, প্লাস্টিক শিট বা কুশি দিয়ে ঢেকে দিন, যাতে ভারী বৃষ্টি না ঢোকে, আবার সামান্য বায়ু চলাচল থাকে।
- উপরে টিনের ছাউনি দিলে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা স্থিতিশীল থাকে।

পরিচর্যা (Turning & Monitoring)

১. তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ

- প্রথম ৭-১০ দিনের মধ্যে তাপমাত্রা ৪৫-৬০°C পর্যন্ত উঠতে পারে-এটা স্বাভাবিক।

২. উল্টানো (Turning)

- ১০-১২ দিন পর প্রথমবার, এরপর প্রতি ১০-১৫ দিন অন্তর কম্পোস্ট উল্টিয়ে মিশিয়ে দিন।
- এতে বাতাস ঢোকে, পচন সমান হয়, অপ্রয়োজনীয় গ্যাস বেরিয়ে যায়।

৩. আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ

- হাতের মুঠোয় ধরে দেখবে, খুব শুকনা মনে হলে হালকা পানি ছিটিয়ে দিবেন।
- অতিরিক্ত ভিজে গেলে ছায়াযুক্ত অবস্থায় কিছুটা খোলা রেখে অতিরিক্ত আর্দ্রতা বের করে নেবেন।

৪. সময়সীমা

- সাধারণত বাংলাদেশে ৪৫-৬০ দিনের মধ্যে ট্রাইকো-কম্পোস্ট পুরোপুরি তৈরি হয়ে যায় (ঋতু ও তাপমাত্রার উপর কিছুটা নির্ভরশীল)।

ট্রাইকো-কম্পোস্ট প্রস্তুত হওয়ার লক্ষণ

সম্পূর্ণ পাকা ট্রাইকো-কম্পোস্টের বৈশিষ্ট্য:

- রঙ গাঢ় বাদামি-কালচে
- মাটির মতো দানাদার, হাতে নিলে ঝুরঝুরে
- কোন কাঁচা গন্ধ নেই, বরং হালকা মাটির গন্ধ
- তাপমাত্রা আশেপাশের পরিবেশের কাছাকাছি
- খড়, পাতা, আবর্জনা ইত্যাদি মূল আকৃতি বেশিরভাগই ভেঙে গেছে

এই অবস্থায় ট্রাইকো-কম্পোস্ট ব্যাগে ভরে ছায়াযুক্ত ঠান্ডা স্থানে রেখে ২-৩ মাস পর্যন্ত কার্যকর রাখা যায়।

মাঠে ব্যবহার পদ্ধতি (Application in Field)

বাংলাদেশি ফসলের জন্য সাধারণ সুপারিশ:

১. ধান/গম ইত্যাদি শস্যফসল

- জমি তৈরির সময় প্রতি হেক্টরে ২-৪ টন (প্রতি শতকে ২-৪০ কেজি) ট্রাইকো-কম্পোষ্ট মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যায়।

২. সবজি ও ভেষজ ফসল

- গর্ত/বেড তৈরি করার সময় প্রতিটি গর্তে ২০০-২৫০গ্রাম
- বা প্রতি শতকে ৫০-৮০ কেজি ট্রাইকো-কম্পোষ্ট মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিন।

৩. ফলগাছ (আম, লিচু, পেয়ারা, ডালিম ইত্যাদি)

- গাছের আকার অনুযায়ী ড্রিপ লাইনের চারদিকে গোল করে ৫-১০ কেজি ট্রাইকো-কম্পোষ্ট দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিন, বছরে ১-২ বার।

৪. নার্সারি/চারা উৎপাদন

- পটিং মিক্স বা বেড তৈরির সময় মাটিঃবালি/কোইলডাস্টঃকম্পোষ্ট (১:১:১) মিশ্রণের মধ্যে ২০-২৫% ট্রাইকো-কম্পোষ্ট ব্যবহার করলে ফল ভালো হয়।

স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত সতর্কতা

- গর্ত তৈরি, স্তর দেওয়া ও উল্টানোর সময় গ্লাভস ও মাস্ক ব্যবহার করলে ভালো।
- Trichoderma সাধারণত মানুষ ও প্রাণীর জন্য ক্ষতিকর নয়, তবে ধূলাবালি বা স্পোর বেশি শ্বাসে গেলে অ্যালার্জি হতে পারে-সতর্ক থাকতে হবে।
- কাঁচা গোবর ও আবর্জনা ব্যবহারের আগে যদি সম্ভব হয় কিছুটা শুকিয়ে নেওয়া ভালো-মাছি/দুর্গন্ধ কম হয়।
- রাসায়নিক সার ও কীটনাশক থেকে দূরে, আলাদা জায়গায় ট্রাইকো-কম্পোষ্ট সংরক্ষণ করুন।



অজৈব/অপচর্নশীল বর্জ্য থেকে আয়

পুনর্ব্যবহারযোগ্য অজৈব বর্জ্যকে পুনঃব্যবহার (Recycle) ও নতুন কাজে ব্যবহার (Repurpose) করে আয় করা যায়। নিচে একটি সম্ভাব্য ব্যবসায়িক ধারণা প্রদান করা হলোঃ

অজৈব বর্জ্য সংগ্রহ কেন্দ্র স্থাপনঃ

এলাকার জনগনকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর সচেতন করে গড়ে তোলার পর (কিছু প্রক্রিয়া উপরে “কমিউনিটি ও সামাজিক উদ্যোগ” এ বর্ণনা করা হয়েছে) এলাকার সমমনা কয়েকজন মিলে একটি “অজৈব বর্জ্য সংগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন” করে অজৈব বর্জ্য সংগ্রহ করুন। এরপর সেগুলোকে বিক্রয়যোগ্য (নতুন পণ্য তৈরী করে বিক্রি, স্থানীয়/জাতীয় রিসাইক্লারদের নিকট বিক্রি) আয় করা যায়।

সংগ্রহ কেন্দ্রের বর্ণনা

স্থান ও অবস্থান:

- সবার জন্য সহজে প্রবেশযোগ্য এবং দৃষ্টিগোচর (যেমন: বাজারের আশেপাশে, স্কুল বা কমিউনিটি সেন্টারের কাছে) জায়গা

নির্বাচন করতে হবে।

- সমতল, পরিষ্কার ও ছাউনিযুক্ত ঘর হতে হবে। নদীর ধার থেকে কিছুটা দূরে হলে ভালো হয়।
- কমপক্ষে ৫০ স্ফার মিটার মতো জায়গা থাকলে ভালো হয়, যেখানে সকল বর্জ্য আলাদা করে রাখা ও সংরক্ষণ করা যাবে।

ধরন ও ডিজাইনঃ

- বিভিন্ন ধরনের বর্জ্যের জন্য আলাদা লেবেলযুক্ত বস্তা রাখতে পারেন (যেমন বোতল ও হার্ড প্লাস্টিকের জন্য একটি, পলিথিন ও মোড়কের জন্য আরেকটি, কাপড়ের জন্য আরেকটি ইত্যাদি)।
- বর্জ্য পরিমাপের জন্য বড় দাঁড়িপালা ও হিসাব সংরক্ষণের জন্য রেজিস্টার খাতা থাকতে হবে।
- পাতলা পলিথিনগুলোকে সংকুচিত করতে বেলিং মেশিন বা বিকল্প যেকোনো ব্যবস্থা করুন।

পরিচ্ছন্নতা ও প্রস্তুতি:

- কি ধরনের বর্জ্য নিবেন এবং কি নিবেন না-তা সাইনবোর্ডে ছবি সহ উলেখ করুন। এ বিষয়ে গ্রাহকদের/ভাঙ্গারীওয়ালাদের বুঝিয়ে বলুন।
- সংগ্রহ কেন্দ্রে শুধুমাত্র পরিষ্কার ও শুকনা অজৈব বর্জ্য জমা দিতে উৎসাহিত করুন। খাবারের প্যাকেট, কন্টেইনার থাকলে শুকিয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে আসতে বলুন, তবে পানিতে ধুয়ে আনা যাবে না তা জানিয়ে দিন।
- স্থানীয় ভাঙ্গারীওয়ালাদের মাধ্যমে সংগ্রহ করলে তাদেরকে যথাযথভাবে বর্জ্য সংগ্রহের প্রশিক্ষণ দিন।

নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিধি:

- সংগ্রহ কেন্দ্রে কাজ করা স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য দস্তানা, মাস্ক ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখুন।
- কেন্দ্রটি নিয়মিত পরিষ্কার করুন যাতে চারপাশে কোনও ছড়ানো বর্জ্য না থাকে।
- যথাযথ স্যানিটেশন ব্যবস্থা (শৌচাগার, হ্যান্ড ওয়াশ, ইত্যাদি) ও প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- বিন ভর্তি হয়ে গেলে তা দ্রুত খালি করুন, না হলে বাতাসে প্লাস্টিক উড়তে পারে।
- স্থানীয় পরিবেশ দূষণ এড়াতে সংগ্রহকৃত প্লাস্টিকগুলো ঢেকে বা বস্ত্রে সংরক্ষণ করুন। অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র কাছাকাছি রাখুন।

কিভাবে করবেন

- দল গঠনঃ শুরুতে এলাকার সমমনা কয়েকজন (সর্বোচ্চ ১০ জন) মিলে একটি দল গঠন করুন।
- নামকরণঃ আপনার প্রতিষ্ঠানের একটা নাম দিন এবং লোগো ডিজাইন করুন।
- অংশীদারী চুক্তিনামাঃ কে কি কাজ করবে, কে কত টাকা ও সময় বিনিয়োগ করবে এবং তার ভিত্তিতে কে শতকরা কত ভাগ লাভভ্যাংশ পাবে ইত্যাদি উলেখপূর্বক একটি চুক্তিনামা করুন; যাতে নিজেদের ভিতর লাভ কম-বেশী পাওয়া নিয়ে কোনো মনমালিন্যের সৃষ্টি না হয়।
- গঠনতন্ত্রঃ প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যক্রম কিভাবে চলবে তার একটা গঠনতন্ত্র তৈরী করুন। পরবর্তীতে একটা পলিসি এবং সকল ধরনের অপারেশন লিখিত আকারে রাখবেন; যাতে কোনো কর্মচারী চলে গেলেও প্রতিষ্ঠানের কোনো ক্ষতি না হয়।
- লিগ্যাল ডকুমেন্টসঃ প্রথমেই ট্রেড লাইসেন্স ও দোকান ভাড়া চুক্তিপত্র করে ফেলুন। পরবর্তীতে টিন, বিন ইত্যাদি করবেন।
- ব্যাংক হিসাব খোলাঃ হিসাব-নিকাশে স্বচ্ছতা রাখার জন্য, যেকোনো ধরনের অনাকাঙ্খিত দূর্ঘটনা এড়াতে এবং ব্যাংকিং লোন পেতে ব্যবসার নামে হিসাব খুলে লেনদেন করবেন।
- স্থানীয় অভিবাসকদের সহযোগিতা অর্জনঃ
 - ❖ এবার স্থানীয় গণ্য-মান্য ব্যক্তিদের এলাকার বর্জ্যজনিত বিবিধ সমস্যার কথা তুলে ধরণ, বিবিধ চাক্ষুষ প্রমাণ, ভিডিও ইত্যাদি প্রদর্শনপূর্বক যেখানে-সেখানে বর্জ্য ফেলার কুফল সম্পর্কে বুঝিয়ে আপনাদের পরিকল্পনা বলুন।
 - ❖ তাদের সাথে কথা বলতে গিয়ে তর্কে জড়িয়ে যাবেন না। আপনি একদিন বললেই সে আপনার কথা তিনি মেনে নিবেন-এটা ধরে নেয়া ঠিক হবে না।



- ❖ তার কথার মাঝে কথা বলবেন না। আবার তার সাথে কথা বলতে গিয়ে এমন কোনো কঠিন শব্দ ব্যবহার করবেন না যার সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা আপনার নেই।
- ❖ তাকে ব্যবসার কথা বলা যাবে না। যেখানে-সেখানে বর্জ্য ফেলার কুফল এবং আপনারা বিনা পারিশ্রমিকে সপ্তাহে একটা দিন এলাকায় পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম করতে চান, একটা ফেসবুক গ্রুপ খুলে ও উঠান বৈঠকের মাধ্যমে এলাকাবাসীকে সচেতন করে এলাকার উন্নয়ন ঘটাতে চান ইত্যাদি বলবেন।
- স্থানীয় সরকারের সহযোগিতা অর্জনঃ এরপর এলাকার গন্য-মান্য ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গকে সাথে নিয়ে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা)-র সাথে দেখা করে আপনার এলাকার সমস্যার কথা জানান ও সমাধান করুন।
- এলাকাবাসীর আস্থা অর্জনঃ প্রথমে কোনো স্বার্থ ছাড়াই এলাকার উন্নয়ন করলে এবং মানুষ তার সুফল পেতে শুরু করলে এলাকাবাসী আপনারদের দলকে ভরসা করতে শুরু করবে। এরপর তাদেরকে ডেকে যেখানে-সেখানে বর্জ্য ফেলার ক্ষতিকারক প্রভাব সম্পর্কে বুঝিয়ে বলুন। সেখানে আপনারা বলতে পারেন-আপনারদের বাড়ীর পুরাতন কাপড়, পরিষ্কার পাতলা পলিথিন, বোতল এগুলো কিনে নেবো। আমরা একটি সংগ্রহশালা দিবো-আপনারা সেখানেও বিক্রি করতে পারেন অথবা স্থানীয় ভাঙ্গারীওয়ালাদের কাছেও দিতে পারেন।
- ফেসবুক পেইজ খোলাঃ এলাকার উন্নয়ন থামানো যাবে না। তাহলে আপনারদের প্রতি মানুষ আস্থা হারাবে। তাই ফেসবুক পেইজে জনগনকে সম্পৃক্ত করে আপনারদের বিবিধ পদক্ষেপ ও এলাকার উন্নয়নের খবর দিতে থাকুন।
- স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সাথে জোট তৈরীঃ স্থানীয় ভাঙ্গারীওয়ালাদের কি কি বর্জ্য নিবেন ও তার দাম নির্ধারণ করে দিন। তার সাথে ভালো করে বুঝিয়ে বলুন পাতলা পলিথিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছাড়া নিবেন না। তাছাড়া, যারা স্থানীয় রিসাইক্লারদের সাথে সু-সম্পর্ক তৈরী করুন; যাতে তাদের কাছে বর্জ্য বিক্রয় করতে পারেন। অজৈব বর্জ্যের শ্রেণিবিভাগ হাতে-কলমে বোঝার জন্য প্রয়োজনে সেখানে চাকরী করুন অথবা তাদের নিকট হতে শেখার চেষ্টা করুন।
- তহবিল যোগানোঃ সংগ্রহ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল যোগাতে যুব উন্নয়নের সাথে যোগাযোগ করে তাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার মাধ্যমে যে লোন দেয় সেটা নিতে পারেন। অথবা, সব থেকে ভালো পথ হলো-নিজেরা/ভাঙ্গারীওয়ালাদের মাধ্যমে পুরাতন কাপড় সংগ্রহ করে ব্যাগ তৈরি করে বিক্রি করে টাকা জমানো। এক্ষেত্রে আপনারদের দলের কেউ এটা করতে পারলে বেশী লাভ পাবেন। এই ব্যাগগুলোকে কাপড় রঙ করার কালি দিয়ে রঙ করার পর তার উপর একটু ডিজাইন করলে এটা অনলাইনে বিক্রির যোগ্য ফ্যাশনেবল ব্যাগও তৈরী করা যেতে পারে। তবে তার জন্য নিজেদের এ কাজ আগে শিখতে হবে।
- সংগ্রহ কেন্দ্র স্থাপনঃ এরপর যথাযথ স্থান নির্বাচন করে বর্জ্য ক্রয় বা সংগ্রহ করা শুরু করুন। পুরাতন কাপড় থেকে ব্যাগ, প্লাস্টিক বোতল থেকে শো-পিস ও বিবিধ ব্যবহার্য জিনিস তৈরী করে বিক্রি করুন। ইউটিউবে এগুলোর ধারণা পাবেন। পাতলা প্লাস্টিক এসডিসি'র নিকট বিক্রি করতে পারেন-ভালো দাম পাবেন; তবে ফরিদপুরে এসডিসি'র পাইরোলাই সিস প্লান্টে পৌঁছে দিতে হবে। আপনার সংগ্রহশালা থেকে বিক্রি করতে হলে Recycle Jar Ecosystem Ltd. এর নিকট বিক্রি করতে পারেন।



কিছু সাবধানতা ও পরামর্শ

- তথ্য সংরক্ষণ ও প্রযুক্তির ব্যবহারঃ রেজিস্টার খাতায় এবং কম্পিউটারে দৈনিক ক্রয়, বিক্রয়, স্টক, আয় ও ব্যয়ের হিসাব রাখুন যথাযথভাবে। এটা একদিকে যেমন পার্টনারদের মধ্যে হিসাবের স্বচ্ছতা বজায় রাখে তেমনি ব্যাংকিং ঋণ ও দাতা সংস্থার ফান্ড/গ্রান্টস পেতে দারুনভাবে সাহায্য করে। পরবর্তীতে হিসাবরক্ষণের সফটওয়্যার/এপ্লিকেশন ব্যবহার করতে পারেন। এক্ষেত্রে, প্লাস্টিকজাত বর্জ্য ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাব রাখতে Recycle Jar Ecosystem Ltd. উদ্ভাবিত WasteX app ব্যবহার করতে পারেন। এর মাধ্যমে “প্লাস্টিক ক্রেডিট” পাওয়ার মাধ্যমে আপনার আয় বৃদ্ধি করতে পারেন।
- আর্থিক হিসাবে স্বচ্ছতাঃ বেশীরভাগ পার্টনারশীপ ব্যবসা নষ্ট হয় আর্থিক হিসাবের গড়মিল হবার কারণে; তাই পার্টনারদের মধ্যে ব্যবসার যাবতীয় হিসাব পরিষ্কার রাখবেন। প্রয়োজনে মাসের শুরুতে অন্তত একবার মিটিং করে সেসব পেশ করার পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়াদি (চ্যালেঞ্জসমূহ ও সেটা অতিক্রমের উপায়, কর্ম পরিকল্পনা, কর্ম কৌশল ইত্যাদি) নিয়ে আলোচনা করবেন।
- অনাকাঙ্ক্ষিত দূর্ঘটনাঃ আপনার ব্যবসার ঝুঁকিসমূহ (রিস্ক ফ্যাক্টরস) বের করে সেগুলো নিরসন করার পদক্ষেপ ও কৌশল বের করে কাজ করুন। যেমন-
 - ❖ শত্রুতাবশতঃ কেউ যেন সংগ্রহশালায় আগুন না দেয়-তার জন্য সবার সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখুন।
 - ❖ উন্নতমানের বৈদ্যুতিক তার ও অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার নিশ্চিত করুন।
 - ❖ প্রাকৃতিক দুর্যোগে সহনশীল ঘর তৈরী করুন।

- **একতাঃ** দলের ভিতর শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখবেন; তাহলে পারস্পরিক বন্ধন অটুট থাকবে। পার্টনারশীপ চুক্তিতে বিনিয়োগ/কাজ অনুযায়ী লভ্যাংশের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে তা আপনার প্রতিষ্ঠানের পলিসি অনুযায়ী নিয়মিত পরিশোধ করবেন। তাহলে দলের একতা বজায় থাকবে।
- **সর্বদা শেখার মানসিকতাঃ** কোনো কাজ সফলভাবে করতে হলে কাজটি সম্পর্কে যত বেশী জ্ঞান অর্জন করবেন কাজটি করা ততটা সহজ ও আর্থিক ক্ষতি কম হবে। তাই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বই পড়ুন, খবর শুনুন/পড়ুন, সফল ব্যক্তি/সোস্যাল মিডিয়া থেকে জ্ঞান অর্জন করুন।
- **নেটওয়ার্ক বৃদ্ধিঃ** সফল হতে এই সেক্টরে সফল ব্যক্তি, দাতা সংস্থা, ক্রেতা ও বিবিধভাবে সাহায্যকারী ব্যক্তিবর্গের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখুন। একজন ভালো মেন্টরও নির্বাচন করে নিতে পারবেন।
- **ধৈর্যশীলতাঃ** আপনাকে বুঝতে হবে কাজটি শ্রোতের বিপরীতের। আপনি আমাদের শত শত বছরের অভ্যাসে আঘাত দিয়েছেন; তাই মানুষের এই আচরণ পরিবর্তন করা সহজ হবে না; তাই ধৈর্য ধরুন। আপনার ঘর থেকে শুরু করে বাইরের সবার নিকট হতে প্রচণ্ড বাঁধা, কটুক্তি ও অপমানের শিকার হবেন আপনি। নিজেকে বলুন-যে যাই বলুক- আমি জানি, আমি সমাজের কল্যাণের জন্য কাজ করছি। স্ব-প্রণোদিত হোন।
- **সৃজনশীলতাঃ** সর্বদা নতুন কিছু তৈরী করার চিন্তায় ডুবে থাকুন। তাহলে বর্জ্য দিয়ে অনেক ধরনের পণ্য তৈরী করতে পারবেন। মনে রাখবেন, সবগুলো নয়-একটা পণ্য জনপ্রিয় হলেই আপনার ব্যবসার বৃদ্ধি ঘটবে।
- **Stakeholder Analysis:** আপনার কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যারা উক্ত কার্যক্রম দ্বারা প্রভাবিত (উপকার/ক্ষতি) হয় তারা সকলেই আপনার কার্যক্রমের স্টেকহোল্ডার বা অংশীজন। আপনাদের একটা তালিকা করা উচিত কারণ আপনার ব্যবসাকে সফল করতে সাহায্য করতে পারেন-আর কারা বন্ধ/ক্ষতি করে দিতে পারে? আর তখনই আপনি কৌশল গ্রহণ করতে পারবেন-কিভাবে সাহায্যকারীদের সাহায্য অর্জন করবেন-আর যারা বাঁধা দিতে পারে তাদের কিভাবে প্রতিহত করবেন।

SWOT Analysis:

মনে রাখবেন প্রথম দু'টো (অর্থ্যাৎ S-Strengths & W-Weaknesses) আভ্যন্তরীণ অর্থ্যাৎ আপনার/আপনার দলের এবং O-Opportunities & T-Threats) বাহ্যিক অর্থ্যাৎ বাইরের সমাজ, পরিবেশ ইত্যাদির। আসুন, আমরা নিচে এই ব্যবসার সম্ভাব্য কিছু SWOT Analysis করার চেষ্টা করিঃ

S-Strengths (আপনাদের সবল দিক-এই ব্যবসা সফল করতে)ঃ

- আমরা সবাই সমমনা ও একতাবদ্ধ। আমাদের পারস্পরিক বন্ধন খুব দৃঢ়।
- আমাদের বর্জ্য নিয়ে ব্যবসা করার মাধ্যমে সমাজের কল্যাণ করার মানসিকতা আছে।
- এ ব্যবসা করার আমাদের যথেষ্ট জ্ঞান আছে এবং আরও জ্ঞান অর্জন করার মানসিকতা আছে।
- আমাদের ভিতর প্রায় সবাই সৃষ্টিশীল এবং এ ধরনের কাজে তাদের অভিজ্ঞতা আছে।
- আমাদের দলের ২/১ জন সেলাইয়ের কাজ ও শো-পিস তৈরীর কাজ জানে।
- আমাদের দলের প্রায় সবার অন্যকে বুঝানো বা কথা দ্বারা প্রভাবিত করার ক্ষমতা আছে।
- স্থানীয় সরকারী, বেসরকারী কর্মকর্তা ও ভাঙ্গারীওয়ালাদের সাথে আমাদের ভালো সম্পর্ক।

W-Weaknesses (আপনাদের দুর্বল দিক-এই ব্যবসা সফল করার আপনাদের অন্তরায়সমূহ)ঃ

- আমাদের পুঁজির অভাব। এখনও আমাদের এ ব্যবসা শুরু করার যথেষ্ট জ্ঞান নেই।
- তাড়াতাড়ি লাভ না পেলে আমরা এটা চালিয়ে যেতে পারবো না।
- দলীয় কোন্দল সৃষ্টি হতে পারে।
- এ ব্যবসা লাভজনক হবে কি না এ বিষয়ে আমাদের বিশ্বাসের অভাব আছে।

O-Opportunities (বাইরের পরিবেশে কি কি সুযোগ আছে--এই ব্যবসা সফল করতে)ঃ

- এলাকায় এই ব্যবসার কাঁচামাল প্রচুর পরিমাণে আছে।
- উৎপাদিত বা ক্রয়কৃত পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা আছে।
- এ ব্যবসার প্রতিযোগী কম এবং আগামী দিনে এর সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।
- ভালো কাজ করলে সরকারী ও বেসরকারী দাতা সংস্থার সাহায্য পাবার সম্ভাবনা আছে।
- সরকারী (যুব উন্নয়ন, ইউএনও, পৌরসভা) ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ (এনজিও) এ ব্যাপারে খুব আন্তরিক ও সহযোগিতাপূর্ণ।
- এলাকাবাসী এ ব্যাপারে অনেকখানি সচেতন; তাই তাদেরকে বুঝানো অনেক সহজ হবে।

T-Threats (বাইরের পরিবেশে কি কি বাঁধা আছে -যার কারণে এই ব্যবসা বন্ধ/ক্ষতি হতে পারে)ঃ



- এলাকাসী অসহযোগিতা করতে পারে।
- অগ্নিকাণ্ড ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে পারে।
- পারিবারিক চাপ আসতে পারে।
- প্রয়োজন পরিমাণ কাঁচামাল নাও পেতে পারি।
- উৎপাদিত পণ্য লাভজনক দামে বিক্রি নাও হতে পারে।

উপরে কিছু উদাহরণ দেয়া হয়েছে মাত্র। আপনার এলাকার উপর ভিত্তি করে আপনি এই তালিকা তৈরী করবেন। এরপর কাজ হলো-কৌশল (স্ট্রাটেজি) নির্বাচন করা; কিভাবে আপনি/আপনারা সকল দুর্বলতাকে সবলতায় এবং সকল বাঁধাগুলোকে সুযোগে পরিনত করবেন/প্রশমিত করবেন/কমিয়ে আনবেন।

৪.৩ বর্জ্য থেকে আয় করার কিছু উদাহরণ

আমাদের দেশে বর্জ্য নিয়ে সফলভাবে ব্যবসা করার অনেক উদাহরণ আছে। নিচে এমন কিছু প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করা হলোঃ

এসডিসি

২০১৬ সাল থেকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করছে। এসডিসি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে একটি লাভজনক ব্যবসায় রূপান্তরিত করেছে। যেমন-

- **জৈব বর্জ্য থেকেঃ** এসডিসি ফরিদপুর, মাগুরা, বরগুনা ও চাপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভায় গৃহস্থালী ও প্রাতিষ্ঠানিক রান্নার বর্জ্য সংগ্রহের সেবা প্রদানের মাধ্যমে আয় করছে। তাছাড়া সংগৃহীত বর্জ্যের কিছু অংশ দ্বারা জৈব সার উৎপাদন করেও লাভবান হচ্ছে।
- **অজৈব বর্জ্য থেকেঃ** এসডিসি প্লাস্টিকজাত বর্জ্য পাইরোলাইসিস প্রক্রিয়ায় রিসাইক্লিং করে পাইরোলাইসিস তেল ও কার্বন উৎপাদন ছাড়াও প্লাস্টিকের বিবিধ ফার্ণিচার ও বোর্ড তৈরী করছে।

Workaholic BD

ফরিদপুরে ওয়ার্কহোলিক বিডি নামে একটি যুব সংগঠন বর্জ্য (প্লাস্টিকজাত ও কাপড়) থেকে বিবিধ রকমের শো-পিস, খেলনা, ফ্যাশনাবল ব্যবহার্য জিনিস, আসবাবপত্র ইত্যাদি তৈরী করে লাভবান হচ্ছে। (বিস্তারিত পূর্বে)

রিসাইকেল জার ইকোসিস্টেম লিমিটেড

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক (একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক) এর মার্কেট লিঙ্কেজ এবং ভ্যালু চেইন উদ্ভাবন করেছে রিসাইকেল জার। ওয়েস্টক্স নামক এক উদ্ভাবনী মোবাইল অ্যাপ এর উদ্ভাবক রিসাইকেল জার, যার শুরু হয়েছিলো পৃথিবীর সর্ব-বৃহৎ ম্যানথ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন-কে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক মুক্ত করার জন্য। রিসাইকেল জার এর এই উদ্ভাবন বিশ্বব্যাংক এবং United Nations Office for Project Services (UNOPS) দ্বারা স্বীকৃত। বর্তমানে রিসাইকেল জার সুন্দরবন এর চারপাশের এলাকার বাইরেও সারা বাংলাদেশে তাদের ওয়েস্টক্স মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক (একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক) এর মার্কেট লিঙ্কেজ এবং ভ্যালু চেইন নিয়ে কাজ করছে।

Waste Concern

ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত একটি সংগঠন যারা কমিউনিটি পর্যায়ে বর্জ্য সংগ্রহ করে কম্পোস্ট সার তৈরির মডেল প্রবর্তন করে। তাদের ব্যবস্থায় বর্তমানে পাঁচটি প্ল্যান্ট প্রতিদিন-২০ টন জৈব আবর্জনাকে কম্পোস্টে রূপান্তর করেছে এবং এটি লাভজনক উদ্যোগ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এই মডেলটি দেশের ২০টিরও বেশি শহরে অনুকরণ করা হয়েছে। Waste Concern অনেক মানুষের কর্মসংস্থানও করেছে এবং বাংলাদেশকে কার্বন ক্রেডিট থেকে আয় করতে সাহায্য করেছে (জৈব সার প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রিনহাউস গ্যাস কমিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন)।

Garbage Man

গার্বজম্যান তাদের Trash to Cash প্লাটফর্মের মাধ্যমে প্লাস্টিক বা কাগজের বর্জ্যের বিপরীতে পয়েন্ট বা কুপন দিয়ে থাকে; যা পরে কেনাকাটায় ব্যবহার করা যায়।

অন্যান্য উদ্যোগ

দেশের বিভিন্ন স্থানে আরও অনেক ছোট বড় উদ্যোগ রয়েছে। যেমন- পোশাক কারখানার বুট কাপড় থেকে খলে ব্যাগ তৈরি করে কিছু প্রতিষ্ঠান ভাল ব্যবসা করছে। কেউ প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার করে ইট বা টাইলস বানানোর পরীক্ষা চালাচ্ছে, আবার কেউ পুরনো রঙের ক্যান বা

বোতল সংগ্রহ করে সেগুলো শিল্পকারখানায় কাঁচামাল হিসেবে সরবরাহ করছে।

৪.৪ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কিভাবে গ্রিনহাউস গ্যাস (মিথেন) নিঃসরণ কমায়?

বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান কারণ হলো গ্রিনহাউস গ্যাস (GHG) নিঃসরণ, যার মধ্যে মিথেন একটি শক্তিশালী গ্রিনহাউস গ্যাস। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঠিক কৌশল অবলম্বন করে এই মিথেন নিঃসরণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব। বাংলাদেশে দ্রুত নগরায়ন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বর্জ্যের পরিমাণও বাড়ছে, যা পরিবেশের ওপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করছে। এখানে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কিভাবে গ্রিনহাউস গ্যাস, বিশেষ করে মিথেন নিঃসরণ কমায়, তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো।

মিথেন গ্যাস এবং বর্জ্যের সম্পর্ক

মিথেন (CH_4) কার্বন ডাই অক্সাইডের (CO_2) চেয়ে প্রায় ২৫ গুণ বেশি শক্তিশালী গ্রিনহাউস গ্যাস, যা স্বল্প মেয়াদে বায়ুমন্ডলে তাপ আটকে রাখার ক্ষেত্রে অধিক কার্যকরী। যখন জৈব বর্জ্য (যেমন - খাদ্য বর্জ্য, কৃষি বর্জ্য, মলমূত্র) অক্সিজেনবিহীন পরিবেশে (অ্যানারোবিক অবস্থা) পচে যায়, তখন মিথেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশের বেশিরভাগ উন্মুক্ত বর্জ্য ফেলার স্থান (ডাম্পিং সাইট) এবং ল্যান্ডফিলগুলোতে এই অ্যানারোবিক পচন প্রক্রিয়া ঘটে, যা মিথেন নিঃসরণের অন্যতম প্রধান উৎস।

কিভাবে সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা মিথেন নিঃসরণ কমায়?

সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কৌশলগুলি মিথেন নিঃসরণ কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রধান কৌশলগুলি নিচে আলোচনা করা হলো:

১. বর্জ্য হ্রাসকরণ (Waste Reduction) এবং পুনর্ব্যবহার (Recycling):

- **বর্জ্য হ্রাসকরণ:** প্রথমেই বর্জ্য উৎপাদন কমানোর দিকে মনোযোগ দিতে হবে। কম বর্জ্য মানে কম বর্জ্য নিষ্পত্তি এবং ফলস্বরূপ কম মিথেন উৎপাদন। এতে পণ্য উৎপাদন এবং পরিবহন জনিত কার্বন পদচিহ্নও কমে।
- **পুনর্ব্যবহার:** প্লাস্টিক, কাগজ, ধাতু এবং কাঁচের মতো অজৈব বর্জ্য পুনর্ব্যবহার করার মাধ্যমে নতুন পণ্য তৈরির জন্য কাঁচামালের প্রয়োজন কমে। এর ফলে কাঁচামাল উত্তোলন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া যে পরিমাণ শক্তি ব্যয় হয় এবং গ্রিনহাউস গ্যাস গর্ত হয়, তা হ্রাস পায়। পুনর্ব্যবহারযোগ্য বর্জ্য ল্যান্ডফিলে না যাওয়ায় সেখানে মিথেন তৈরির সুযোগও কমে।

২. জৈব বর্জ্য কম্পোস্টিং (Composting) এবং অ্যানারোবিক ডাইজেশন (Anaerobic Digestion):

- **কম্পোস্টিং:** জৈব বর্জ্যকে (যেমন - খাদ্য বর্জ্য, গাছের পাতা, সবজির খোসা) নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে (এরোবিক প্রক্রিয়া) পচিয়ে জৈব সার তৈরি করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় মিথেন তৈরি হয় না, বরং কার্বন ডাই অক্সাইড ও পানি উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন কম্পোস্ট মাটির উর্বরতা বাড়ায় এবং রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমায়, যা পরোক্ষভাবে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমাতে সাহায্য করে।
- **অ্যানারোবিক ডাইজেশন:** এটি একটি উন্নত প্রযুক্তি যেখানে জৈব বর্জ্যকে অক্সিজেনবিহীন পরিবেশে পচানো হয়, তবে নিয়ন্ত্রিত উপায়। এই প্রক্রিয়ায় বায়োগ্যাস উৎপন্ন হয়, যা মূলত মিথেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের মিশ্রণ। এই বায়োগ্যাস সংগ্রহ করে বিদ্যুৎ উৎপাদন, তাপ শক্তি বা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এতে ল্যান্ডফিল থেকে সরাসরি বায়ুমন্ডলে মিথেন নিঃসরণ রোধ করা যায় এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমে।

৩. স্যানিটারি ল্যান্ডফিল (Sanitary Landfills) এবং ল্যান্ডফিল গ্যাস ক্যাপচার:

- **স্যানিটারি ল্যান্ডফিল:** এটি আধুনিক বর্জ্য নিষ্পত্তির একটি পদ্ধতি, যেখানে বর্জ্যকে স্তরে স্তরে ফেলা হয় এবং মাটি বা অন্যান্য উপাদান দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এই ল্যান্ডফিলগুলো এমনভাবে ডিজাইন করা হয় যাতে লিচেট (বর্জ্য থেকে নিঃসৃত দূষিত তরল) এবং ল্যান্ডফিল গ্যাস সংগ্রহ করা যায়।
- **ল্যান্ডফিল গ্যাস ক্যাপচার:** স্যানিটারি ল্যান্ডফিল থেকে নির্গত ল্যান্ডফিল গ্যাস (যাতে প্রচুর মিথেন থাকে) সংগ্রহ করার জন্য গ্যাস ক্যাপচার সিস্টেম স্থাপন করা হয়। এই সংগৃহীত গ্যাসকে বিদ্যুৎ উৎপাদন বা অন্যান্য শক্তি উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়। এটি সরাসরি বায়ুমন্ডলে মিথেন নিঃসরণ বন্ধ করে এবং একই সাথে নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে।

৪. বর্জ্য থেকে শক্তি (Waste-to-Energy - WTE):

- যেসব বর্জ্য পুনর্ব্যবহার বা কম্পোস্ট করা যায় না, সেগুলোকে ইনসিনারেশন (Incineration) বা পাইরোলাইসিস (Pyrolysis) এর মতো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুড়িয়ে বিদ্যুৎ বা তাপ উৎপাদন করা যায়। আধুনিক WTE প্ল্যান্টগুলোতে বর্জ্য পোড়ানোর সময় নির্গত গ্যাসগুলো ফিল্টার করা হয় যাতে পরিবেশ দূষণ কম হয়। এই প্রক্রিয়াগুলো ল্যান্ডফিলের উপর চাপ কমায় এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার হ্রাস করে, যা গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সুপারিশ

বাংলাদেশের জন্য একটি কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা মডেল তৈরি করা অত্যন্ত জরুরী, যা মিথেন নিঃসরণ কমাতে সহায়ক হবে। এর জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিচে উল্লেখ করা হলো:

- **বর্জ্য পৃথকীকরণ (Waste Segregation):** উৎস পর্যায়ে বর্জ্য পৃথকীকরণ (জৈব, অজৈব, পুনর্ব্যবহারযোগ্য) নিশ্চিত করা। এটি কম্পোস্টিং, পুনর্ব্যবহার এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য বর্জ্য সংগ্রহ সহজ করে তোলে।
- **কমিউনিটি-ভিত্তিক কম্পোস্টিং:** স্থানীয় পর্যায়ে ছোট আকারের কম্পোস্টিং প্ল্যান্ট স্থাপন করা, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে যেখানে প্রচুর জৈব বর্জ্য উৎপন্ন হয়।
- **আধুনিক ল্যান্ডফিল:** বিদ্যমান ডাম্পিং সাইটগুলোকে স্যানিটারি ল্যান্ডফিলে রূপান্তর করা এবং ল্যান্ডফিল গ্যাস ক্যাপচার সিস্টেম স্থাপন করা।
- **বর্জ্য থেকে শক্তি প্রকল্প:** যেখানে সম্ভব, সেখানে বর্জ্য থেকে শক্তি উৎপাদন প্ল্যান্ট স্থাপন করা, বিশেষ করে বড় শহরগুলোতে।
- **জনসচেতনতা বৃদ্ধি:** বর্জ্য হ্রাস, পুনর্ব্যবহার এবং সঠিক বর্জ্য নিষ্পত্তির বিষয়ে জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং উৎসাহিত করা।



বর্জ্য থেকে শক্তি উৎপাদন এবং মিথেন কমানোঃ

চিত্রটিতে দেখানো হয়েছে কিভাবে ল্যান্ডফিল থেকে মিথেন গ্যাস নির্গত হয় এবং এর প্রভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। একই সাথে, সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কিভাবে মিথেন নিঃসরণ কমানো যায়, তার একটি ফ্লোচার্ট দেওয়া হয়েছে: পুনর্ব্যবহার, জৈব সার তৈরি, কম্পোস্টিং এবং শক্তি উৎপাদন।

এখানে বর্জ্য
না



